ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

আমরা পাকিস্তানি নই

আমি ফালহা খাতুন। আমার বিয়ের নয় বছর পর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তখন আমরা ছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তারুয়া গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে আমরা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার বাবা কুদ্দুস উদ্দিন পাকসেনাদের হাতে মারা যান ২৫ মার্চ ১৯৭১। আমরা এই খবর পাই পরদিন সকালে। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম, সেই রাতে পাঞ্জাবিরা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। আমার শ্বশুর ও স্বামী আমাদের গ্রাম থেকে দূরে আশুগঞ্জে গিয়ে দেখেছিল যে সেখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেই কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল বেরোতে লাগল। ভাবতাম কেমন করে মানুষ মানুষকে এভাবে মারতে পারে। আমার শ্বশুর বলত, বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। যদি একটারে পাইতাম জনমের শিক্ষা দিতাম। শুনলাম শেখ মুজিব নাকি সাধারণ মানুষকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এবার দেশে একটা বড় ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তখন মনে করতাম, বাঙালি কি আর পাকিস্তানিদের সাথে লড়াই করে টিকতে পারবে? আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অনেক কষ্ট ছিল। লোকজন ভয়ে বাজারে যেত না। সেখানে মিলিটারিরা ক্যাম্প করে বসে থাকে। আবার কয়েক দিন পরে শুনলাম ভারত থেকে নাকি সৈন্য আসছে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য। এই খবর শুনে মনে একটু ভরসা পেলাম।

হঠাৎ একদিন দেখি দলে দলে সৈন্য আমাদের বাড়িতে এসে উঠল। আমরা ভয়ে লুকিয়ে পড়লাম। তাদের মধ্যে উঠল, বোনেরা আমরা পাকিস্তানি নই, আমরা ভারত থেকে এসেছি আপনাদের সেবা করতে। আপনাদের মুক্ত করতে। তার কথা শুনে আমাদের ভয় কিছুটা কেটে গেল। আমরা বেরিয়ে এলে তারা বলল, আমাদের সবাইকে পানি খাওয়ান। আমরা পানির সাথে যে যা পারি কিছু নাশতা দিলাম। তারা সকলে তা খেয়ে আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে অনেক তাঁবু ফেললো, আর সেখান থেকে দূরে লক্ষ্য করে গোলা মারতে লাগল। সে কি আওয়াজ, মনে হয় যেন কানের পর্দা ফেটে যাবে। এর পরদিন তারা গ্রামে ঘোষণা করে দিল, যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক তারা যেন সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করে। সেখানে তাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। গ্রামের খুব অল্পসংখ্যক মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দিল। আমার স্বামীও সেখানে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমার শ্বশুরকে কোনোভাবেই রাজি করাতে পারলেন না বলে হল না। এর কয়েক দিন পরে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন লোক এসে বলল, আপনারা যার যার নিরাপদ স্থানে সরে যান। এই গ্রামে পাকিস্তানিদের হামলা করার আশঙ্কা আছে। তাদের কথা শুনে গ্রামের সকল মানুষ নিরাপদ স্থানে চলে গেল। আমরা গেলাম আমার এক খালাতো বোনের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখি সারা বাড়িতে লোকে লোকারন্য। তিল পরিমাণ ঠাঁই নেই। মূল ঘরে, রান্নঘরে, গোয়াল ঘরে, উঠানে অসংখ্য মানুষ। তাদের সবার চোখে মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ। জানতে পারলাম তাদের ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ পাকিস্তানিরা পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সারা রাত সেখানে সবার সঙ্গে কথা বলে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে উঠে আবার রওনা দিলাম আমার বাপের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দুই-চার দিন থাকার পর শুনলাম আমাদের গ্রামে যে পাকা গমক্ষেত ছিল তা সব পুড়িয়ে ফেলেছে দস্যুরা। আর সেই বছর গমের ফলনও হয়েছিল ভালো। তাই সবার খুব দুঃখ হয়েছিল। এর ফলে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিল । সেই সময়ে কয় বেলা যে না খেয়ে থেকেছি তার হিসাব নেই। এভাবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

যারা যুদ্ধ করেছে তাদের কেউ কেউ ফিরে এসেছে আর অনেকের কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছে তখন অনেকেই অনেক কিছু হারিয়েছে।

সূত্র: জ- ১২৯৮২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আবদুলাহ আল মামুন	**ফালেহা খাতুন**
অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৬০, সম্পর্ক : দাদি

গুলির বস্তা কাঁধে দিল

১৯৭১ সালে আমার নানা আবুল কালাম খন্দকার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোর্ট রোডের একটি বাসায় থাকতেন। তার এক বোনের মেয়ের জামাই এই সময়ে তার বাসায় বেড়াতে আসে। তার আত্মীয় ছিল মেজর আবুল হোসেন। ইতিমধ্যে দেশের পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। ২৬ মার্চ সকালবেলা নানা বাজার করতে বের হয়ে শুনতে পেলেন যে, পাকিস্তানিরা ঢাকায় আক্রমণ করেছে। আমার নানা তখনও বুঝতে পারেননি যে, এই স্বাধীনতাযুদ্ধের ভয়াবহতা কতটুকু হবে। এর কিছুদিন পর পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনী ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল বাঙালিকে কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়। আমার নানার আত্মীয় মেজর আবুল হোসেন নির্দেশানুযায়ী ঢাকায় যান। দিন হয়ে গেলেও তিনি ফিরে আসেননি। ঢাকায় যাওয়ার প্রায় মাসখানেক পর আমার নানা জানতে পারেন যে, সকল বাঙালি অফিসারকে পাকিস্তানিরা মেরে ফেলেছে। অফিসারদের মধ্যে আবুল হোসেনও ছিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানিরা আশুগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে ঢুকে পড়ে। তারা বর্ডার বাজার ও জগৎ বাজার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আমার নানা তার নিজের দোকান পুড়তে দেখেছেন। এরপর নানা তার পরিবার নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যান।

নানা তার গ্রামের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য শহরে আসতেন। একদিন তিনি শহরে আসার সময় পাকিস্তানিরা তাকে দেখে ফেলে। তারা নানাকে বন্দুক উঁচিয়ে বলে, এদার আও। নানা তাদের কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন সেখানে আরেকজন বাঙালি আছে। হানদাররা নানাকে এবং ওই লোককে গুলির বস্তা কাঁধে দিল। আমার নানা ছিল শক্তি-সমর্থ। তার গুলির বস্তা তুলতে খুব অসুবিধা হলো না। কিন্তু অন্য লোকটি ছিল দুর্বল। সে গুলির বস্তা সহজে তুলতে পারল না। হানাদাররা নানা এবং লোকটিকে তাদের পেছন পেছন যাওয়ার জন্য বলল। যাওয়ার পথে দুর্বল লোকটি একবার পড়ে গেল। হানাদাররা তাদের ক্যাম্পে এসে গুলির বস্তা রাখতে বলল। তারপর লোকটির গুলির বস্তা থেকে দুটো গুলি বন্দুকে ভরল এবং তাকে গুলি করে মেরে ফেলল এবং আমার নানাকে বলল যে, তাকে যদি আর কোনো দিন এদিকে দেখে তাহলে তারও এই অবস্থা হবে। এই বলে হানাদাররা নানাকে ছেড়ে দিল। গ্রামে ফেরার পথে নানা দেখতে পেলেন যে, কয়েকশ মানুষকে পাকিস্তানিরা লাইন করে দাঁড়িয়ে রেখেছে। জায়গাটার নাম ছিল দরিয়াপুর। নানার গ্রাম পয়াগ থেকে কাছে। যাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাদের সামনে একটি বিরাট গর্ত। একজনকে গুলি করে আরেকজনকে গুলি না করে এই গর্তে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সবাইকে ফেলে তারা কিছু গুলি করল এবং তাদের ওপর মাটি চাপা দিয়ে গণকবর তৈরি করল। নানা এই দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সবাইকে নিয়ে আরেক গ্রামে চলে যান। সেখানে একটি বাড়িতে থাকার সময়ে ৪০-৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নানার বাসায় আশ্রয় নিতে চান। নানাভাই তাদের আশ্রয় দেন। প্রায় দুই মাস থাকার পর মুক্তিবাহিনী চলে যায়।

এরপর আসে ১৬ ডিসেম্বর। জয় বাংলা, জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে চারপাশ। সেদিন আমার নানার আনন্দের সীমা ছিল না।

সূত্র: জ- ১২৯৮৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
এমদাদুল বারী (ইমাদ)	**আবুল কালাম খন্দকার**
অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : মধ্যপাড়া, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল: ১০	বয়স : ৫৮, সম্পর্ক : নানা

আমরা কাউকে হত্যা করিনি

আমি মো. রেজাউল করিম। একই গ্রামের আমরা ১৭ জন ছাত্র একত্রিত হয়ে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হই। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিন দিন পর আগরতলায় উপস্থিত হই। তারপর নবীনগর হতে আমার সাথে আসা সাতজন ট্রেনিংয়ের জন্য রিক্রুট হয়। আমাদের ২৫০ জনকে গৌহাটি লোহায়বল ট্রেনিং সেন্টারে ইকো কোম্পানির অধীনে প্রথমে ৩০ দিন বিভিন্ন অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হয়। ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয় ১৮০ জনকে। যুদ্ধের স্থান ছিল সিলেট, কৈলাসটিলা, খাসিয়া ও জৈয়ন্তিয়া। আমরা বাকি ৭০ জন হাই এক্সপোসিভ প্রস্তুতকারক হিসেবে আরও ২৯ দিন ট্রেনিং করি। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ চলাকালীন যদি ভারতীয়দের কাছ থেকে অস্ত্র না পাই, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো অস্ত্র ও বোমা তৈরি করে যেন মুক্তিযোদ্ধার হাতে দিতে পারি। প্রথম ৩০ দিনের ট্রেনিংয়ে ২৫০ জনের মধ্যে ১ম স্থান ও ২য় ২৯ দিনে জি এল ডাবিউ এম স্থান লাভ করি। তারপর লোহারবন হতে আমরা গ্রামের সাতজন বাংলাদেশে আসার উদ্দেশে আগরতলায় আসি। নবীনগর, বঞ্চারামপুর এই দুই থানায় এম. এন. এ দেওয়ান আবুল আব্বাস (বাচ্চু মিয়ার) সাথে আমাদের দেখা হয়। তিনি জরুরি ভিত্তিতে আমাদেরকে তিন নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার সফিউলাহর অধীনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা, আখাউড়া, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, নরসিংদীর পরিস্থিতিসহ একটি যুদ্ধের কাগজ প্রদান করে তার কাছে আমাদের পাঠান। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলে, আমরা বাংলাদেশে ঢুকি। আমরা এই এলাকার প্রথম মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের সাথে আর্মি, ইপিআর, আনসার সদস্য ছিল না। তারা ছিল আলাদা ভাবে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায়। আমরা আসার পর ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত যে সকল মুক্তিযোদ্ধা ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় যাবে তাদেরকে নিরাপদ রাস্তা দেখিয়ে খাবারসহ অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র সরবরাহ করেছিলাম। আমাদের হাতে ১৮০ জন লোকের হত্যার পরওয়ানা ছিল নবীনগর থানায়। আমরা কাউকে হত্যা করিনি বরং সকলকেই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে নিয়ে এসে দেশের কাজে লাগাই। আমাদের একই গ্রামের সাতজনের সাথে আরও ছিল ১১ জন। আমাদের কমান্ডার ছিলেন গোপালপুরের হামিদ মিয়া এবং টু আই সি ছিলেন আমার চাচা জাকির হোসেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছেন আর আমরা যারা বেঁচে আছি তারাও মরার পথে। প্রথমত, ভারত হতে আসার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উজানিসার ব্রিজের ওপর পাঞ্জাবি ও রাজাকারের ব্যারিকেড থাকায় রেলক্রসিং ও সিএন্ডবি রোড পার হওয়ার সময়ে আমরা পাঞ্জাবি সৈন্যের মুখোমুখি হই। আমরা এক রাত্র একদিন গলাপানি ও বুকপানিতে নেমে আমন ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ও ক্রলিং করে তিনজন পাঞ্জাবিকে হত্যা করি। এক রাত্র একদিন না খেয়ে পানিতে ছিলাম। পরের রাত্রে এক রাজাকারকে হাতে নাতে ধরে ফেলি। তাকে বুঝিয়ে আমাদেরকে উজানিসার ব্রিজ পার হতে সাহায্য করার কথা বলে ছেড়ে দিই। সে আমাদেরকে সংকেতের মাধ্যমে পার করে। এই সংকেত উক্ত এলাকার রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের উভয়ের নিরাপদের জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তখন উক্ত পথে চলাচলের জন্য শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো অসুবিধা হতো না। এমনিভাবে মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং শেষে দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। মুক্তিযোদ্ধারা কোন সেক্টরের অধীনে কীভাবে যাবে আমরা সেই পথ নির্দেশনা দিতে সক্ষম হই।

আমরা দেশের ভেতরে নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, কসবা, নরসিংদির মেঘনা নদীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। বর্তমানে আমি একজন অসহায়, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা।

সূত্র: জ- ১৩০০২

সংগ্রহকারী:
মো. মজিদ হোসেন
অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
১০ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ২৫

বর্ণনাকারী:
মো. রেজাউল করিম (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
গ্রাম : নূরজাহানপুর, থানা : নবীনগর
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বয়স : ৫৩

শুরু হলো নতুন আতঙ্ক

আমার দাদা আব্দুল খালেকের বয়স তখন আনুমানিক পঞ্চাশ। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার বিটঘর গ্রামের বাসিন্দা। শহরের বাইরে এই ছোট গ্রামটিতে যুদ্ধের তেমন প্রভাব পড়েনি। দেশে তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। তবে আগের মতোই স্বাভাবিক থাকে বিটঘর গ্রামের জনজীবন। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী প্রথম বিটঘর গ্রামে আসে। তারা গ্রামের বাড়িঘর লুটতরাজ শুরু করে। এরপর থেকে প্রায়ই রাজাকাররা এসে গ্রামবাসীর কাছ থেকে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি লুট করতে লাগল। এক রাতে রাজাকার বাহিনী আব্দুল খালেকের বাড়িতে ও আশপাশের অন্যান্য বাড়িতে হানা দেয়। ফিরে যাওয়ার সময়ে তারা বাড়ি থেকে যুবকদের ধরে নিয়ে যেতে থাকে। আব্দুল খালেকের বাড়ি থেকেও তার দ্বিতীয় ছেলে কাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। কাদের তখন কলেজের ছাত্র। তাকে ফিরিয়ে আনতে খালেক তার ছোট ছেলেকে নিয়ে রাজাকার বাহিনীর পিছু পিছু যেতে থাকে। গ্রামের ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে শুনে পাশের গ্রাম থেকে মুক্তিবাহিনী এসে আক্রমণ করে বসে। শুরু হয় রাজাকার বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ। প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ করে রাজাকার বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ফাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় বন্দি ছেলেদের নিয়ে খালেক বাড়ি ফিরে আসে।

রাজাকারেরা যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে গ্রামের পূর্ব দিকে পিছু হটতে থাকে। তারা একটি খাল সাঁতরে ধানক্ষেতে লুকায়। মুক্তিবাহিনী তখনও রাজাকারদের পিছু ছাড়েনি। ধানক্ষেতের মধ্যে তারা হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকে এবং কয়েকজন রাজাকারকে ধরে ফেলে। যুদ্ধ শেষে তারা আব্দুল খালেকের বাড়ি ফিরে আসে। খাওয়া-দাওয়া করে। শেষ রাতের দিকে ধরা পড়া রাজাকারদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে যায়। কিছু রাজাকার অবশ্য পালিয়ে বাঁচতে পেরেছিল।

পাকিস্তানি মিলিটারিরা তখন সরাইলে ক্যাম্প করে অবস্থান করছে। পালিয়ে বাঁচা রাজাকাররা মিলিটারির ক্যাম্পে এসে তাদের বিপর্যয়ের কথা বলে। পরদিন সকাল থেকেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামের সবাই যার যার ঘরে বসে আছে। আব্দুল খালেক তখন ঘুমুচ্ছিলেন। তার মা-ই প্রথমে দেখতে পেলেন পূর্ব দিক থেকে শত শত মিলিটারি ক্রলিং করে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি ছুটে গিয়ে তার ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। সব শুনে আব্দুল খালেক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রামের সবাইকে মিলিটারি আসার খবর জানান। তখন গ্রামের পুরুষরা পালিয়ে গিয়ে আশ-পাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আশ্রয় নেয়। বেলা ১১টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামে পৌঁছায়। অনেকেই আব্দুল খালেকের কথা আমলে না দিয়ে গ্রামে থেকে গিয়েছিল। তাদের ধরে এনে মিলিটারিরা এক জায়গায় জড়ো করে। তাদের মধ্যে থেকে ২০-৪০ বছর বয়সীদের গুলি করে। অন্যদের ছেড়ে দেয়। তখন চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। তাদের দাফন করার মতো লোকও গ্রামে ছিল না। গুটিকয়েক বৃদ্ধ ছাড়া এই গ্রামে আর কোনো পুরুষ ছিল না। তারাই কোনো রকমে কিছু লাশ জড়ো করে গণকবর দেয়।

লাশের গন্ধে শেয়াল, কুকুর, শকুন আসতে থাকে। মিলিটারিদের হামলার পর রাতে গ্রামে শুরু হলো নতুন আতঙ্ক। শত শত শেয়াল কুকুর যেন পাকহানাদার বাহিনীর মতোই হিংস্র হয়ে উঠে। ঘরে ঘরে এসে তারা হানা দিতে লাগল। শেয়াল কুকুরের ভয়ে সবাই দরজা জানালা আটকে ঘরে বসে থাকে। একটু পর পর শোনা যায় শেয়াল কুকুরের রক্তহিম করা হিংস্র হাঁকডাক। এমনি করে মিলিটারি ও রাজাকার বাহিনী কয়েকদিন পর পর গ্রামে এসে হানা দিতে থাকে। আর গ্রামের মানুষ পালিয়ে বাঁচতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ

চলতে থাকে। বিটঘর ও তার আশপাশের গ্রাম ডিসেম্বরের শুরুতে শত্রুমুক্ত হয়। সরাইলের মিলিটারি ক্যাম্প তখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। মিলিটারিরা তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পিছিয়ে যায়। পরাজয় অনিবার্য জেনে তারা ভৈরবে আসে এবং মেঘনা নদীর ওপর বড় সেতুটি ভেঙে দেয়। কিন্তু তাদের পালাবার উপায় নেই। কারণ ভৈরবের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ আর পূর্বে মেঘনা নদী ভারতের মিত্রবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। প্রায় পাঁচ হাজার বন্দিকে ভারতীয় মিলিটারিরা ধরে নিয়ে যায়।

সূত্র: জ- ১৩০০৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
তারেক মাহমুদ	**আব্দুল খালেক**
অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : বিটঘর, ডাক : শাখাইতি
৭ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ০৮	থানা : সরাইল, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	বয়স : ৮৭, সম্পর্ক : দাদা

বনের মধ্যে হাসপাতাল তৈরি করেন

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। আমার বাবা ও গ্রামের অনেকেই ভারতে আশ্রয় নেয়। তারা মালপত্র নেয়নি বলে তাদের খাওয়ার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তাই তারা মালপত্র নেয়ার জন্য বাংলাদেশে আসে। কানুমিয়া নামক এক ব্যক্তিও বাবার সাথে আসে। আমার বাবা যখন মালপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শত্রু বাহিনী তাদের গুলি করলে কানু মিয়ার বলিষ্ঠ শরীর গুলির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি লা ইলাহা ইলাললাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুলাহ বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমার বাবা তখন তাকে চিকিৎসার জন্য ভারতে নিবেন বলে নৌকায় উঠালেন। তিনি ভেবেছিলেন সেখানে তার চিকিৎসা করানো যাবে, কিন্তু নৌকার মধ্যে তার মৃত্যু হয়। সেই করুণ কাহিনী আমার বাবার হৃদয়ে আজও গাঁথা আছে।

এছাড়া, অনেক অত্যাচারের কাহিনী আমার বাবা আজও স্মরণ করতে পারেন। যেমন, পাকবাহিনী কসবার দোকানপাট ও আশপাশের অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট (অব.) এম. এ কাদের (মিয়াচান মিয়াজী) এর যুদ্ধের কাহিনী :

তিনি আমার কাকা। ১৯৬৭ সালে মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে ভর্তি হয়ে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অ্যাবোটাবাদ জেলার হাজারা ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং ও ডাক্তারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। লাহোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে কর্তব্যরত থাকাকালীন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে ও গণমানুষের করুণ অবস্থা শুনে তিনি পাকিস্তানের লাহোরের সম্মিলিত হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বহু কষ্টে ঢাকায় চলে আসেন। পরে নিজস্ব বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার আকছিনা গ্রামে আসেন। সেখানে জানতে পারলেন যে আকছিনা গ্রামে লাইনে দাঁড় করিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারসহ ১৬ জনকে গুলি করে হানাদার বাহিনী মেরে ফেলেছে। ওই দিনই সন্ধ্যায় তিনি বহু বিপদ-আপদ ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে পা বাড়ালেন। ভারতে পৌঁছেই তিনি ক্যাপ্টেন গাফ্ফার, ক্যাপ্টেন আক্তার, মেজর হায়দার, মেজর খালেদ মোশারফ-এর সংগে দেখা করেন। ভারতের মেজর জেনারেল আরিবায়ের সঙ্গে তার ইন্টারভিউ হয়। তারপর তাঁকে ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের সঙ্গে ২নং সেক্টরে আগরতলা, আখাউড়া, কসবা, সালদা নদীতে মুখোমুখি যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার জন্য পাঠান। একনিষ্ঠভাবে তিনি যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য বনের মধ্যে একটি হাসপাতাল তৈরি করেন। বহু আহতকে আগরতলা জি, বি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন এবং নিহতদের কুল্লাপাথরে সমাহিত করেছেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পরও ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২০ গোলন্দাজ বাহিনী ইত্যাদিতে চাকরিরত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে সামরিক হাসপাতাল হতে পেনশন নিয়ে বাড়িতে আসেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি গরিবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। আমরা এই মহাত্মার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। আলাহ্ যেন তাঁকে আরও কল্যাণমূলক কাজের তৌফিক দান করেন।

সূত্র: জ-১৩১০৯

সংগ্রহকারী::	বর্ণনাকারী::
রুবিনা ইসলাম (মনি)	**হাজী নুরুল ইসলাম মাষ্টার**
শাহপুর আফছার উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : বাবা
৭ম শ্রেণি	**বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ.কাদের (চাঁনমিয়া মিয়াজী)**
	গ্রাম : আকছিনা, থানা : কসবা , জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	সম্পর্ক : কাকা

গ্রামের নাম শাহপুর

গ্রামের নাম শাহপুর। এই গ্রামে বাস করত আব্দুর রহমানের পরিবার। আব্দুর রহমানের ছিল দুই ছেলে। তাদের নাম ফুল মিয়া ও তোতা মিয়া। ১৯৭১ সালে যখন পাকহানাদার বাহিনী কসবা থানার প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তখন শাহপুর গ্রামেও তারা আসে। শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথম দিকেই তারা আব্দুর রহমানকে ধরে নিয়ে যায় কসবা টি. আলী বাড়ির ক্যাম্পে এবং গুলি করে হত্যা করে। তার বড় ছেলে ফুলমিয়ার এক ছেলে এবং দুটি মেয়ে ছিল। ছেলেটির বয়স ৬ বছর। ফুল মিয়া ও তোতা মিয়া ব্যাবসা করত। একদিন পাকহানাদার বাহিনী এসে ফুল মিয়ার বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেয়। তখন ফুল মিয়া এবং তোতা মিয়া খেতে বসেছিল। তারা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গোয়াল ঘরের পেছনের একটি ডোবার মধ্যে নেমে পড়ে । ফুল মিয়ার মা দরজা খুলে দেয়। পাকসেনারা ঘরে ঢুকে ফুল মিয়ার অসুস্থ চাচাতো ভাই আহাম্মদ আলীকে ধরে কসবা টি. আলী বাড়ির ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে তাকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। পাকসেনারা চলে যাওয়ার পর তারা ডোবা থেকে উঠে এসে দেখে তাদের অসুস্থ চাচাতো ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে। তখন তারা কান্না শুরু করে। সেদিন রাতে তারা পালিয়ে যায় ভারতে। সেখানে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। যুদ্ধের পর বাড়িতে ফিরে আসে।
ফুল মিয়ার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে কান্না শুরু করে।

সূত্র: জ -১৩১৭০

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
মাহমুদুর রহমান (শাওন)	**ফুলমিয়া ভূঁইয়া**
নবম শ্রেণি, রোল : ৬৩, বিভাগ : বিজ্ঞান	গ্রাম : মীর শাহপুর, থানা : কসবা
	জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	বয়স : ৭৮, সম্পর্ক : দাদা

নানু আমাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল

বাংলাদেশের এমন কোনো শহর, বন্দর, গ্রাম নেই যেখানে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসররা এসে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা না করেছে। ধ্বংস করেছে তারা হাজার হাজার পরিবার। কাদের মহাসিনের পরিবার তাদের মধ্যে একটি। কাদের মহাসিন আমার নানুর বড় ভাই। তিনি ছিলেন একজন সাদা সিদে মানুষ।

সেদিন সকাল ৭টার দিকে তিনি শোনেন বাজারে হানাদার বাহিনী এসেছে। সকাল ৯টার দিকে সাহস করে তিনি বাজারে যান। দেখেন সেখানে টু শব্দটিও নেই। বাজারের ভেতরে গিয়ে দেখেন অনেক লাশ পড়ে আছে মাটিতে। কারো চোখে, কারো মুখে, কারো কপালে, কারো শরীরে গুলির চিহ্ন। ভয়ে তিনি আঁতকে ওঠেন। তিনি দেখেন, ঝুলঘরে ছয়টি মেয়ের লাশ। দেখে মনে হচ্ছে শুকুন তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। নানা আরো আঁতকে ওঠেন যখন তার বন্ধু কাশেম ও তার ছেলের লাশ দেখেন। কাশেমের মাথায় একটি গুলি ও হাতে একটি কাটা চিহ্ন। তার ছেলেকে বটগাছের সাথে আছড়ে মেরেছে নির্মম হানাদাররা। নানা বাড়ি এসে সবাইকে এসব বলেন আর কাঁদেন । তিনি হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, 'মুসলমান না মুসলমানের ভাই? ভাই কি ভাইরে মারে? তাও আবার এত কষ্ট দিয়া?'

অসময়ে তিনি গোসল করতে পুকুরে গেলেন। হঠাৎ ঠা ঠা গুলির শব্দ শোনেন তিনি। দৌড়ে বাড়িতে এসে দেখেন হানাদার বাহিনী তার মেয়ে, ছেলের বউ আর মাকে মারছে। তিনি গিয়ে তাদের একজনকে বললেন ভাই, এদের ছেড়ে দাও। এরা তো কোনো দোষ করে নাই। বলতে দেরি হলো কিন্তু তাকে ধরে চোখ বাঁধতে দেরি হলো না। চোখে দেখছেন না কিছুই, শব্দ শুনছেন ছেলেমেয়েদের কান্না। তার মধ্যে শুনলেন ৭টা গুলির শব্দ। হঠাৎ তাকেও গুলি করে ৩টা। তিনি মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগলেন। চোখের বাঁধন খুলে দেখেন তার দুই মাসের ছোট মেয়েকে আছড়ে মেরেছে আমগাছের সাথে। পাঁচ বছরের অন্য মেয়েটার চোখে দুটি গুলির চিহ্ন, ছেলে রকিবের কপালে দুইটা আর মার কপালে একটা গুলি। মা-ছেলেমেয়ের লাশ দেখছেন কিন্তু তার স্ত্রীর লাশ দেখছেন না। হঠাৎ দেখলেন পুকুর পাড়ের সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে তার স্ত্রীর লাশটা। তার স্ত্রীর বুকে ও মাথায় গুলি করেছে। নানা ছটফট করছেন গুলির আঘাতে। আলাহ্ বলে চিৎকার দিয়ে বললেন, এই দৃশ্য দেখার জন্য আমাকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছ?

নানুদের বাড়ি হানাদার বাহিনী এলে নানু নানাকে নিয়ে কাদের মহাসিন নানার ওখানে আশ্রয়ের জন্য আসেন। নানা নানু এসে দেখেন কেউ নেই। লাশ আর রক্ত। কাঁদতে লাগলেন নানু। একটু সামনে গিয়ে দেখেন তার মা ও ভাইয়ের বউয়ের রক্তমাখা শরীর পড়ে আছে। মাকে এমন অবস্থায় দেখে নানু আরও কাঁদতে থাকেন। মনে পড়ে যায় তার ভাইয়ের কথা। গিয়ে দেখেন ঘরে তার বাবার ছবিটা ধরে কাঁদছেন। আর গুলির আঘাতে কষ্ট পাচ্ছেন। বোনকে দেখে কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। বললেন, বোন আমি কাউকে বাঁচাতে পারিনি। গুলি আঘাত তাকে তিল তিল করে মেরেছে। নানু নানা তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখেন সব পুড়িয়ে ফেলেছে হানাদার বাহিনী। খেয়ে না খেয়ে থাকতে হয়েছে তাদের। থাকতে হয়েছে মাটিতে। এসব বলছেন আর নানু কাঁদছেন। নানার কষ্ট তিনি কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। এই ঘটনা তাকে আজও কাঁদায়। নানু আমাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। একাত্তরের যুদ্ধে কত কষ্ট পেয়ে মরেছে মানুষ তা নানার কথা শুনে বুঝতে পারলাম। এভাবে নির্বিচারে হত্যা করেছে লাখ লাখ মানুষকে।

সূত্র: জ-১৩১৭২

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
তাসনীস হাসান সীমান্ত	**লতিফা সরকার**
শাহপুর আফছার উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : নিশ্চিন্তপুর, ডাক : নিশ্চিন্তপুর
নবম শ্রেণি, রোল : ৩৪	থানা : দাউদকান্দি, জেলা : কুমিলা
	বয়স : ৬৯, সম্পর্ক : নানু

সেখানে তাদের কোনো চিহ্ন নেই

আমার বাবা রংপুরে তার ফুফুর বাড়িতে ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে শহরে পাকিস্তানিরা রাতের অন্ধকারে গোলাগুলি করে এবং রাত্রে গোলাগুলির পরেই কারফিউ জারি করে। রংপুর ও মহিগঞ্জের মধ্যে একটা শ্মশান ছিল। সেই

শ্মশানের মধ্যে পাকবাহিনী এপ্রিলের ৪ তারিখে ১২ জনকে গুলি করে হত্যা করে। একজনের নাম জজ মিয়া। তার বাড়ি রংপুরের মুন্সিপাড়ায়। আরেকজনের নাম মন্টু। তিনি ডাক্তার। সবাইকে যখন গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল তখন মন্টু ডাক্তারের পায়ে গুলি লাগে। তিনি মরার ভান করে সেখানে পড়ে থাকেন। পরে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে আসেন এবং পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ভারতে চলে যান।

আমার বাবা পরদিন নিজের চোখে এ দৃশ্য দেখে অনেক ভয় পান। এপ্রিল মাসের ছয় তারিখে আমার বাবা রংপুর তার ফুফুর বাসা হতে কাকিনা হয়ে ২৭ মাইল পথ হেঁটে ভারতের সীতাই চলে যান। সেখানে অনেক অস্থায়ী রিফুজি ক্যাম্প দেখতে পান। পাকিস্তান আমলে তিনি মুজাহিদ ছিলেন। তার সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল। তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। এক অপারেশন করতে গিয়ে কুদ্দুস নামে এক ছেলের সাথে তার দেখা হয়। তার বাড়ি রংপুরের চিলমারি। অপারেশনের সময় পাকবাহিনীর গুলি তার পায়ে লাগে। তখন আমার বাবা অনেক কষ্ট করে কয়েকজনের সাথে তাকে কাঁধে করে প্রায় ছয় মাইল দূরে নিরাপদ জায়গায় বয়ে নিয়ে যান। যাওয়ার পথে তাদের মধ্যে দুইজন কাশেম ও অলি মিয়া মারা যান। তাদের ওপরে মর্টারের গোলা পড়াতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাদেরকে সেখানেই ফেলে আসতে হয়েছিল।

আমার বাবা ও তারা একসাথে অনেক দিন ছিলেন। শহীদদের সমাধি না করায় সেখানে এখন তাদের কোনো চিহ্ন নেই। স্বাধীনতার পর বাবা হেঁটে রংপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসেন। আসার সময় রাস্তার পাশে অনেক মানুষের কঙ্কাল ও হাড়গোড় দেখতে পান। আরও দেখতে পান অনেক বাড়িঘর বাজার দোকান আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অনেক সাধারণ মানুষও মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করে এবং পাকবাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়।

সূত্র: জ-১৩৩২৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শাহানা আক্তার শিফা	**গোলাম কিবরিয়া**
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড স্কুল এন্ড কলেজ	বয়স : ৬০ বছর, সম্পর্ক : বাবা
৮ম শ্রেণি, রোল : ১০	

দেশে নাকি রাক্ষস এসেছে

আমি যখন স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার গড়ে তুললাম তখন কোনো রকম কষ্ট হয়নি। আমাদের অনেক জায়গা-জমি ছিল। সব মিলিয়ে সুখেই ছিলাম। কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব ছিল বুঝতে পারিনি।

তখনকার সময়ের মেয়েদের তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তাছাড়া আমার বাবা ছিলেন মসজিদের মুয়াজ্জিন। ঘরের বাইরে মেয়েরা বের হবে– এটা তার মোটেও পছন্দ ছিল না। আমি আমার মায়ের কাছে কোরআন পাঠ শিখেছি। এছাড়া মূর্খ মানুষ, কিছুই বুঝতাম না। বুঝতে চাইলেও তোর দাদা বোঝায়নি। শুধু বলত মেয়েলোকের এত বেশি বুঝতে হয় না। তখন তিন ছেলে নিয়ে আমি খুবই চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই। তোর বড় কাকার বয়স ছিল দশ বছর। তোর বাবার ছিল চার আর তোর ছোট চাচা ছিল আমার কোলে। তোর বাবা ছিল ডানপিটে, কোনো কথাই শুনতে চাইত না। যত চিন্তা তোর বাবাকে নিয়ে। তখনকার সময়ে তোর দাদার কাছে শুনলাম দেশে নাকি রাক্ষস এসেছে। তখন বুঝতে পারিনি যে এরাই আমাদের শাসন শোষণ করে খাচ্ছে। এরাই মানুষরূপী রাক্ষস।

একদিন শুক্রবার দুপুরে জোহরের আজান পড়ল। একদল পাকিস্তানি আমাদের গ্রামে এসে ঢুকল। তোর দাদা বলল, সব কিছু গুছিয়ে মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। যেমনি কথা অমনি কাজ। তারপর তোর দাদা বলল, খোকাকে দাও। বলেই কোলে তুলে নিল। আমি গামছায় কিছু চাল নিলাম। একটা টিনের বাক্সে কিছু চিড়া-গুড়

নিলাম। ক্ষেত থেকে কিছু সবজি নিতে চাইলে তোর দাদা বলল, ওদিকে আর যেতে হবে না। কখন যে কে দেখে ফেলে, তখন আর রক্ষা থাকবে না।

তারপর আমরা ঘরের পেছন দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তোর বাবাকে ধরে রাখি আমি। তোর বড় চাচা টিনের বাক্সটা হাতে নিয়ে আমাদের সাথে দৌড়াতে লাগল। শুধু আমরাই না আরও অনেকেই জীবন বাঁচানোর জন্য বাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। আমরা সবাই গিয়ে উঠলাম সর্দার বাড়িতে। দেখলাম আরও অনেকেই উঠেছে সে বাড়িতে। আমরা রাতের খাবার সবাই মিলে রান্নার ব্যবস্থা করলাম। রাতে ঘুমানোর সময় মধ্যরাতে কি সব ভয়ানক শব্দ। তোর দাদার কাছে জানতে চাইলাম, কিসের শব্দ? তোর দাদা বলল, গুলির। হঠাৎ সর্দার বাড়ির উঠানে খটর খটর শব্দ। কে যেন আসছে? তোর দাদা, তোর বাবা আর বড় চাচাকে নিয়ে পানিতে নেমে পড়ল। পানিতে ছিল লম্বা লম্বা পানা। তারা মাঝখানে যায়নি কেবল পাড়ের কাছাকাছি জায়গাটায় ছিল। আমি তোর ছোট চাচাকে কোলে নিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বসে থাকি। কত মশা যে কামড়াল তার কোনো হিসাব নেই। কিন্তু একটু নড়িনি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম আরও অনেকে পুকুরের পানিতে আস্তে আস্তে নেমে পড়ছে। আর অনেকেই অনেক ঝোপঝাড়কে আশ্রয় করে লুকিয়ে পড়েছে। ভয়ে কলিজায় একটু পানি নেই। মাথাটা অল্প বের করে তোর বাবাকে কোলে নিয়ে পানিতে দাঁড়িয়ে আছে তোর দাদা। তোর ছোট চাচা ছিল খুবই ছোট তাই পানিতে নামেনি। হঠাৎ গুলির শব্দ। মনে হয়েছিল এবার বুঝি আমরাও শেষ। আবার পেছনে পুকুরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তোর চাচা ঠিক আছে কি না। সারা রাত এভাবেই কাটিয়ে দিলাম। কারও চোখেই ঘুম নেই। কয়েকজনসহ তোর দাদা পানি থেকে উঠল। আমরাও উঠছিলাম। বাড়ির উঠানে গিয়ে দেখি রহমত মিয়ার লাশ। বুঝতে পারলাম তাকেই গুলি করা হয়েছিল। তারপর আমরা সবাই চলে এলাম আমাদের বাড়িতে। চিন্তা করে দেখলাম পরের বাড়িতে মরার চেয়ে নিজের বাড়িতেই মরা ভাল। এমনি করে আরেক দিন আমাদের বাড়িতে এলো পাকিস্তানিরা। আমরা সন্ধ্যা হলেই বাতি নিভিয়ে রাখতাম। তাই চারপাশ অন্ধকার। তোর দাদা ঘরের ফাঁক দিয়ে সবকিছু দেখতে লাগল। একটা কথা আছে, রাখে আল্লাহ মারে কে? তোর দাদা বুদ্ধি করে দিনের বেলায় ঘরের সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। আর পেছনের দরজাসহ অন্য সব জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছিলাম। তারা ভাবল যে আমরা কেউ নেই। তাই চলে গেল। এমনি ভয়ে ভয়ে কয়েকটা মাস কাটল। তারপর শুনলাম দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাক্ষসদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যেদিন এই সু-সংবাদটা শুনলাম সেদিন মনে হলো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটা খুঁজে পেলাম।

সূত্র: জ-১৩৩৪১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শাহাদুল ইসলাম	**জায়েদা খাতুন**
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড স্কুল এন্ড কলেজ	বয়স: ৬৬ বছর
৮ম শ্রেণি, রোল নং-১৬	

একটি যুদ্ধবিমান উড়ে যাচ্ছিল

সারা দেশের মত ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও যুদ্ধ চলছে। ১৯৭১ সালের জুন মাস। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমার দাদিকে নেয়ার জন্য আমার বড় বাবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসলেন এবং তাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে লঞ্চে উঠলেন। সেখানে আরও অনেক নারী-পুরুষ ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর নদীর তীরে কিছু মিলিটারি দেখে তাদের মনে আতঙ্কের শিহরণ জাগল। মিলিটারিরা ইশারায় লঞ্চটি তীরে ভিড়াতে বলল। মিলিটারিদের সাথে কয়েকজন নির্যাতিতা মহিলা ছিল। লঞ্চের চালক তাদের নির্দেশমতো লঞ্চটি তীরে ভিড়াল। তখন সবাই ধরে নিল যে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু মিলিটারিরা তা করল না। তারা ওই মহিলাদেরকে লঞ্চে তুলে দিয়ে নিয়ে

যেতে বলল। এতে সবার মাঝে প্রাণ ফিরে আসল। আমার দাদি ও বড় বাবা আলাহ্‌র কাছে শোকরিয়া আদায় করলেন।

এরপর তারা নির্বিঘ্নে ঢাকায় পৌঁছলো। কিন্তু এ যাত্রা সুখের হলো না। একটি দুঃসংবাদ তাদের নিস্তব্ধ করে ফেলল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের বাড়িতে দাদার বাবা অর্থাৎ আমার বড় দাদা এবং দোকানের কর্মচারীরা ছিল। বাড়ির ওপর দিয়ে একটি যুদ্ধবিমান উড়ে যাচ্ছিল। ওই সময় বিমান দেখার জন্য আমাদের দোকানের কর্মচারীরা গেটের পাশে দাঁড়াল। তাদেরকে ওপর থেকে মিলিটারিরা মুক্তিসেনা মনে করেছিল। তাই তারা বিমান থেকে আমাদের বাড়িতে একটি বোমা ফেলল। বোমার প্রচণ্ড শব্দে আমার বড় বাবা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এতে আমাদের বাড়ির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বাড়ির কয়েকটি ঘর বিধ্বস্ত ও কয়েকটি গাছ ভেঙে গিয়েছিল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরই আমাদের বাড়ির সবাই ঢাকা চলে যায়। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তারপর। আমাদের বাড়িতে এবং দোকানে একই দিনে মিলিটারিরা আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার দাদি এতে খুবই মর্মাহত হন। এ রকম আরও অসংখ্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটেছে।

৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই স্বাধীনতা। তাই এই স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখাই আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সূত্র: জ-১৩৩৪৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রিজুয়ানা আক্তার শীতল	**পিয়ারা বেগম**
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড স্কুল এন্ড কলেজ	বয়স: ৬৩ বছর, সম্পর্ক: দাদি
৮ম শ্রেণি, রোল নং-১৮	

লোকটির পা দুটো ছাড়া কিছুই রইলো না

আমি আমার চাচার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের যে কাহিনী শুনেছি তা থেকে আমার একটি ধারণা হয়েছে এবং সেই দিনগুলোর কথা আমার চোখে জীবন্ত ছবি হয়ে ভাসছে।

শুরু হলো যুদ্ধ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে মাইকে জানানো হলো যে প্রতিটি বাড়িতে বাংকার তৈরি করতে হবে। সবাই যার যার বাড়িতে বাংকার করল। পরদিন রাত প্রায় ১১টায় পৌরসভা থেকে সাইরেন বাজলে আমার চাচা তার পরিবারসহ দ্রুত বাংকারে ঢুকল। রাত প্রায় সাড়ে ১১টায় পাক বাহিনীর বিমান থেকে প্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ওয়াপদায় বোম্বিং করা হয়। সে কি বিকট শব্দ! আমার চাচা তখন আমার দাদা-দাদিকে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণের জন্য চাচার মনে হলো যে, এই বুঝি জীবনের শেষ। সেই রাতটা কাটল ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে। ভয়াবহ রাত্রির কথা আমার চাচার স্মরণ হলে এখনও তার গায়ে শিহরণ জাগে।

সকাল হয়েছে। আমার চাচা তার পরিবারসহ বাংকার থেকে বের হলো মনে হলো যেন মৃত্যুর পরবর্তী নবজন্ম লাভ হয়েছে। তখন সবাই শহর ছাড়ার জন্য যার যা কিছু আছে তা নিয়েই রওনা হলো। আমার চাচা তার পরিবারসহ তিতাস নদীর পাড়ে এলেন। সেখানে বহু মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তা দেখে চাচার খুব খারাপ লাগল। নৌকার জন্য তারা অধীর আগ্রহে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর নৌকা আসে এবং তাতে উঠে বসেন। তার পর পরই কাছাকাছি একটি শেল এসে পড়ল। চতুর্দিকে গোলাবারুদ ছিটিয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস তিনি বেঁচে যান। খানিক পরেই আরেকটি শেল এসে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোক এবং দুইটি গরুর ওপর পড়ল। ভয়ে সবাই জড়োসড়ো ও নিঃস্তব্ধ হয়ে রইলেন। লোকটির পা দুটো ছাড়া আর কিছুই রইল না। আমার চাচা তখন ভয়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তারা চাপুইড় গিয়ে পৌঁছালেন।

সূত্র: জ-১৩৩৫১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী

নিশান আল আবরার	**মোহাম্মদ আশরাফুল আলম**
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড স্কুল এন্ড কলেজ	বয়স: ৫২ বছর, সম্পর্ক: চাচা
৮ম শ্রেণি, রোল: ০৫	

মুজিবের ছবি থাকলে ঘর পোড়াবে

আমি তখন ১৭ বছরের যুবতি। বিয়ে হয়েছে মাত্র। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়। আমি তখন আমাদের গ্রাম সামবাড়িতে থাকি। যখন শুনলাম পাকিস্তানিরা আমাদের বাড়ির দিকে আসছে তখনই ভয়ে বুকটা টিব টিব করে কাঁপতে লাগল। খুব কষ্টে আমরা সবাই পাশের গ্রামে চলে গেলাম। আমাদের ঘরটা খালি থাকলে পুড়িয়ে ফেলবে তাই আব্বা আমাদের বৃদ্ধ চাচা আব্দুল মোন্নাফ মিয়াকে বললেন, আপনি আমাদের ঘরে থাকেন। পাকিস্তানিরা আপনাকে মারবে না। এই বলে বাবা-মাসহ আমরা সবাই চলে গেলাম। আমরা ১০-১২ জন যুবতী মেয়ে একটি পাটকাঠির বেড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করলাম। আমাদের ধারণা ছিল এই ছোট ঘরে পাকিস্তানিরা ঢুকবে না। রাজাকার রেজাউল পাকিস্তানিদেরকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলো। পাকিস্তানিরা আমাদের ঘরের সিন্দুক খুলে ওলটপালট করল এবং বলল শেখ মুজিবের ছবি পেলে ঘর পুড়িয়ে ফেলবে। আমাদের ঘরে ঠিকই শেখ মুজিবের ছবি ছিল কিন্তু ওরা পেল না। তাই কোনো রকমে বেঁচে গেলাম। কয়েকটি দিয়াশলাই খুঁজে পেল, তা নিয়ে গেল এবং বলে গেল আবার এসে ঘরটা পুড়িয়ে ফেলবে। পাকিস্তানিরা যাওয়ার সময় আমাদের ঘরে এসে দরজার দিকে রাইফেল দিয়ে ধাক্কা দিল আর ভয়ে এই দরজা ছেড়ে আরেক দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মরার আগেই আমরা মৃত্যুকে জানলাম, চিনলাম। আমরা জানতাম এবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু! কিন্তু আল্লাহর কি অশেষ রহমত ওরা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরে চলে গেল।

সূত্র: জ-১৬৩৬০

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
রাবেয়া আক্তার	**মাতা**
চাঁদের হাট টিয়ারা এ/বি উচ্চ বিদ্যালয়	
১০ শ্রেণি, রোল: ০৬	

গিয়া পড়লাম পাঞ্জাবিদের সামনে

সেদিন ছিল ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ। হঠাৎ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আমাগো বাড়িতে আইয়া ঢুকল। আমি তখন গাছ থাইকা লাউ পাতা পাড়তেছিলাম। এর মধ্যেই কয়েকজন কইতে লাগল, পাঞ্জাবি আইয়ে! পাঞ্জাবি আইয়ে! আমি এর কিছুই বুঝলাম না। একটা শেল পড়ল আমাগো পাশের বাড়িতে। সবাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। আমিও দৌড়াইতে লাগলাম। আমার বয়স তখন আছিল ৫০ এর মতো। পোলাটা মেট্রিক দিল অইলে। আমার পুতের লাইগা আমি কানলাম আর দৌড়াইতে লাগলাম। সেকি ভয়ানক ব্যাপার, দৌড়ানির মধ্যে রাস্তায় দুইজন কইল, জামসীদের মা, আমরারে লইয়া যাও। আমি পিছের দিকে ফিইরা দেখি, পাঞ্জাবি আমার পিছে আইতাছে। আমি তাদের দেইখা জোরে দৌড় দিলাম। তারাও আমার পিছে দৌড়াইতে লাগল। হঠাৎ গিয়া পড়লাম সিমনার পুকুর পাড়ে চারজন পাঞ্জাবির সামনে। পেছনেরগুলো কইল, ধর শালিরে। সামনে চারজন আমাকে ধরল। তারপর পেছনের পাঞ্জাবিরাও আমারে আইয়া ধরল, কইল, মুক্তিযোদ্ধারা কই বল। কইলাম, আমি কিছুই দেখছি না। মুক্তিযোদ্ধারার কথা না বলায় তারা আমার মাথায় বন্দুক ধরল। আমি ভয়ে হাতজোড় কইরা মাটিতে পইড়া গেলাম। মাটিতে পড়ে যাওয়াতে একজন পাঞ্জাবি কইল, থাক বেটিরে মাইরা লাভ নাই। তারপর

আবার বয়স্ক। এই কথা শুইনা তারা চইলা গেল। তারা ছিল শকুনের মতো। বয়স্ক ছিলাম বলে মারল না। বেইজ্জতিও করল না। তাছাড়া দৌড়াতে দৌড়াতে আধামরাই ছিলাম।
এভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁইচা আইলাম। বাড়িতে আইয়া দেখি কিছুই নাই। সবকিছু পুইড়া ছারখার কইরা দিছে। ঘরে ধানের পাড়া ছিল, বাইরে পলের পাড়া আছিল, সবকিছু শেষ হইয়া গেছে। তারপরও কোনো দুঃখ নাই, কারণ দেশ মুক্ত অইছে। আমরা পাইছি স্বাধীন দেশ।

সূত্র: জ- ১৬৩৬৩

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী :
মাহমুদা আক্তার	**জাহেরা**
চাঁদেরহাট টিয়ারা এ/বি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : টিয়ারা, ডাক : বিটঘর
৭ম শ্রেণি	থানা: নবীনগর, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	সম্পর্ক : দাদি

টুপিটা বের করে মাথায় দিল

১৯৭১ সাল। সেই সময়টা ছিল অত্যন্ত ভয়ানক। সে সময়ের কথা মনে হলে আজও গা শিউরে ওঠে। চোখে আসে। ঢাকায় যখন প্রথমে যুদ্ধ শুরু হয় আমাদের গ্রামের মানুষের সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু পরে যখন সারা দেশে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে তখন পাকবাহিনী গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার শুরু করে। মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করতে থাকে। তখন সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ শুরু করে। পাকবাহিনী যখন আমাদের খাদুরাইল গ্রামে আসতে থাকে তখন আমরা চলে যাই এক আত্মীয়ের বাড়িতে। কিছুদিন থাকার পর জানতে পারলাম যে সেদিকেও শত্রুবাহিনী যাচ্ছে। যাকে যেখানে পাচ্ছে তাকে ধরে ধরে মারছে। তখন আমার স্বামী আমার এক বোনের বাড়িতে আমাকে রেখে আসে। সেখানে আমার এক ভাইপো যায়। তার সাথে আমি আমার বাবার বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। আমরা হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু মাঝপথে সামনে পড়ল পাকিবাহিনী। তাদেরকে দেখে তো আমার ভয়ে প্রাণ যাওয়ার অবস্থা। আমার ভাইপো আমাকে অভয় দিয়ে বলল, কিছু করবে না। আর সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টুপিটা বের করে মাথায় দিল। পাকিস্তানি বাহিনী টুপিওয়ালা মানুষকে কিছু করত না। আমরা যখন তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে আসছিলাম তখন দেখি তারা সবাই প্রায় উলঙ্গ হয়ে খালে গোসল করছে। আমরা ভয়ে ভয়ে জায়গাটা পার হয়ে গেলাম এবং ভালোভাবে বাবার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু সেখানে গিয়েও ওই একই অবস্থা।
মুক্তিবাহিনী আমার বাবার বাড়িতে ক্যাম্প করেছিল। তারা মাটির নিচে গর্ত করে থাকত। কিন্তু মুক্তিবাহিনী যে ওই জায়গায় থাকে তা পাকবাহিনী কি একটা যন্ত্র দিয়ে যেন দেখতে পেত। এ জন্য তারা সড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যাওয়ার সময় তারা বাড়ির সবাইকে নিরাপদে চলে যেতে বলল। মুক্তিযোদ্ধারা সরে গিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নেয়। এর কিছুক্ষণ পরই একটা বোমা মুক্তিবাহিনী যে জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল সে জায়গায় পড়ে। ভয়াবহ শব্দে তা বিস্ফোরিত হয়। এবং সেখানে প্রায় ৮-১০ হাত গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়।
আমার স্বামীর ভাইপো সামসু চালের ব্যবসা করত। একদিন সে চাল নিয়ে দূরের বাজারে বিক্রি করতে যায়। কিন্তু চার-পাঁচ দিন হয়ে যাওয়ার পরও সে ফিরে না আসায় বাড়ির সবাই কান্নাকাটি শুরু করে। সামসু ভয়ানক বিপদের মধ্যে পড়েছিল। সে যখন চালের বস্তাসহ নৌকায় যাচ্ছিল পাকিস্তানি বাহিনী তাকে ধরে ফেলে। সে দেখতে মুক্তিযোদ্ধার মতো ছিল। তারা তাকে মুক্তি ভেবে গুলি করতে উদ্যত হলো। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন রাজাকার ছেলেটিকে চিনত এবং সে যে মুক্তি নয় তা বলল। তখন আর তাকে গুলি করল না। সে বাড়িতে চলে এলো। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে তার মা-বাবা খুব শান্তি পেল।
মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার স্বামীর বাড়ি খাদুরাইল গ্রামে দূরের মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে সময় এক গর্ভবতী মহিলার বাচ্চা হয়। বাচ্চাটিকে নিয়ে সে কত কষ্টই না করেছে। একদিন দূরে শোনা গেল পাকিস্তান বাহিনীর

গাড়ির আওয়াজ। তখন আমাদের গ্রামের মানুষ ছোটাছুটি শুরু করে। এক মহিলা নিজের মনে করে অন্য এক মহিলার বাচ্চা নিয়ে চলে যায়। পরে যখন অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়ে তার বাচ্চার দিকে খেয়াল করে তখন বুঝতে পারে সে তো অন্যের বাচ্চা নিয়ে এসেছে! পরে তার নিজের ছেলেকে সে খুঁজে পেয়েছিল।

সূত্র: জ-১৩০০৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সেলিনা আক্তার	**খাতেমুন নেছা**
দাউদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: খাদুরাইল, ডাক : দাউদপুর থানা ও
৯ম শ্রেণি, রোল নং-০২	জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	বয়স: ৮৫ বছর, সম্পর্ক: নানি

মনোবলই বড় অস্ত্র

আমার নাম তানিয়া আক্তার। বয়স ১১ বছর। আমার দাদার নাম মো: রুহুল আমিন। তার বয়স বর্তমানে প্রায় ৮৫ বছর। আমাদের গ্রামের নাম বড়শালঘর, জেলা কুমিল্লা। আমার দাদার মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এখনও কিছু মনে আছে। তখন সম্ভবত মে মাস। দাদা একদিন বাজার থেকে ফিরছিল। হঠাৎ দেখল লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। ছেলে, বুড়ো, মহিলা, শিশু সবাই গ্রামের পূর্ব দিকে দৌড়াচ্ছে। একজনকে জিজ্ঞেস করায় সে বললো, গ্রামে মিলিটারি আইছে, তাড়াতাড়ি পালাও। আমাদের গ্রামের একেবারে পশ্চিম পাশে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক। পাক মিলিটারিরা ৬-৭টি গাড়ি নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেছিল। দাদা দৌড়ে বাড়িতে এসে দাদু ও বাচ্চাদেরকে ঘরে লুকিয়ে থাকতে বলল। ওই দিন পাকবাহিনী গ্রাম থেকে অনেককে ধরে নিয়ে যায়।

শান্তি কমিটির স্থানীয় দালালদের খবরের ভিত্তিতে মাঝে মধ্যে অভিযানে এসে পাকসেনারা মানুষকে ধরে নিয়ে যেত। গ্রামের হিন্দুরা অনেকেই আগে পালিয়ে গেছে। তবু তারা কিছু ছিল, নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছিল।

একরাতে পাকিস্তানি আর্মিরা আমাদের গ্রামের কিছু বাড়িঘরে এবং সৈয়দপুর বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেকগুলো দোকানপাট পুড়ে যায়। আমার দাদার দোকানও সে রাতে পুড়ে গিয়েছিল। পাশের গ্রামের কয়েকটি বাড়িও পুড়ে গিয়েছিল। কয়েকবার আর্মিরা মুক্তি খোঁজার জন্য এসেছিল।

এক দিনের ঘটনা, দাদা সবে বাজার থেকে বাড়িতে এসেছে, হঠাৎ দশ বারো জন আর্মির একটা দল মার্চ করতে করতে দাদার উঠানে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মুক্তি কাহা হ্যায়?' আর্মি দেখে ভয়ে মহিলারা দৌড়ে ঘরে চলে যায়। আমার বাবা ফখরুল ইসলাম তখন দুই বছরের শিশু, উঠানে বসে খেলছিল। আর্মিরা তাকে দেখে বলতে লাগল, 'বাচ্চা উঠাও।' বাড়িতে আর পুরুষ না দেখে তারা চলে যায়।

আমাদের গ্রামের সংচাইল বাজারের পাশে একটা উঁচু ব্রিজ আছে। দাদা একদিন নৌকা নিয়ে বাজার থেকে ফিরছিল। তখন আর্মিদের একটি ট্রলার ব্রিজের নিচ দিয়ে গ্রামের খালে প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। দাদাকে নৌকায় দেখতে পেয়ে তার দিকে বন্দুক তাক করে এবং দাদাকে তাদের কাছে যেতে ইশারা দেয়। দাদা নৌকা নিয়ে ট্রলারের কাছে যায়। তারা আমার দাদার নাম, বাড়ি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে। তারপর ওরা দাদাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলে ছেড়ে দেয়।

দাদা আরও বলল যে, একদিন পাট কাটার জন্য বাড়ির পশ্চিম দিকের জমিতে যায়। দেখতে পায় একটি ছয়-সাত বছরের শিশুর লাশ পানিতে ভেসে আছে। বাচ্চাটির কপালে একটি গুলির ফুটো ছিল। লাশটি দেখে দাদা শিউরে উঠে। লাশটি পচে মাছি এবং পোকা ধরে গিয়েছিল।

তাদের গ্রামের রেডিওতে যখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় তখন সবাই আনন্দে নেচে ওঠে। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এই দেশের মানুষ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। বাঙালির ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন আর ছিল দৃঢ় মনোবল। এই দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে মুক্তির জন্য মনোবলই বড় অস্ত্র।

সূত্র: জ-১৩০৪১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
তানিয়া আক্তার	**মো. রুহুল আমিন**
কসবা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : বড়শালঘর, থানা : দেবিদ্বার
ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল : ০৭	জেলা : কুমিলা

সেই গুলিতে তিনি শহীদ হন

আমার দাদির মামাতো ভাই আব্দুল খালেক ইপিআর-এ চাকরি করতেন। নবীনগর উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের জুলাইপাড়া গ্রামে তার বাড়ি। তিনি সাথে করে একটি রেডিও এনেছিলেন এবং তা ছিল আমাদের গ্রামের প্রথম রেডিও। সবাই তাদের বাড়িতে রেডিওর গান ও খবর শোনার জন্য ভিড় জমাতো। আমিও যেতাম। খালেক ভাই আমাকে খুবই আদর করতেন। তিনি প্রায়ই রেডিওটি নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমাকে সাথে করে তাদের বাড়িও নিয়ে যেতেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ছুটি নিয়ে তিনি বাড়িতে এলেন। তখন তার বিয়ে ঠিক হল শারপার গ্রামের কাজী বাড়িতে। বিয়ের পর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি চাকরিতে যোগদান করেন।

একদিন ছোট মামা আমাকে নিয়ে কনিকাড়ার খেয়াপার হয়ে জহলা গ্রামের নিকট গেলেন। তখন হঠাৎ করে গুলির আওয়াজ শুনলাম। সকলে ভয়ে ছুটাছুটি শুরু করল। আমি বললাম, মামা চল বাড়িতে ফিরে যাই। তার মাথায় বস্তার মধ্যে ছিল আউশ ধানের বীজ। সে বলল, চল সামনে গিয়ে দেখি। কাল জমিতে ধান বুনতে হবে। মামা আমাকে নিয়ে নবীনগর বাজারে গেল। তখনি আবার গুলির শব্দ শুনলাম। একটু পরে দেখি গুলির আঘাতে রক্তাক্ত নবীনগর শাহ সাহেব বাড়ির টুকুমিয়ার মেয়ের জামাইকে চাঙ্গারি করে শান্তি ডাক্তারের চেম্বারের দিকে নিয়ে আসছে। প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমরা নবীনগর ও আলমনগর সড়কের দক্ষিণ পাশের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। লোকমুখে শুনতে পেলাম চিত্রিগ্রামের পাশে মেঘনা ও তিতাস নদীর মোহনায় পাকবাহিনীর স্টিমার অবস্থান নিয়েছে এবং সেখান থেকে গুলি ছোড়া হচ্ছে। আমরা পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীর তীরে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের পাশ দিয়ে অজস্র গুলি চলে যাচ্ছে। মামা ও আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তাড়াহুড়া করে সাঁতরে ওপারে চলে গেলাম। বাড়িতে এসে দেখি নানাভাই দরজার সামনে বাংকার খুঁড়ছে। ঠিক তখনই একটি পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান নানাভাইকে লক্ষ করে গুলি ছোড়ে। নানা ভাই দৌড়ে ভিতর চলে আসেন এবং আলাহর রহমতে বেঁচে যান। এ সময় গোলার আঘাতে এক শিশু ও একজন যুবকের দুটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

আমার বড় মামার বন্ধু ও মামাতো ভাই বর্তমানে নবীনগরের সংসদ সদস্য এডভোকেট শাহ জিকরুল আহমেদ খোকন মুক্তিযুদ্ধে যান। আমার বড় মামা বর্তমানে নবীনগর পৌর কমিশনার সিরাজুল ইসলাম ভারতে যাওয়ার উদ্দেশে আমাদের বাড়িতে আসেন। তখন আমি তাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বললে তারা লুকিয়ে ভারতে চলে যান।

শ্রাবণ মাসের এক রাতে গুলির শব্দ শুনে সবাই গোরস্থানের উত্তর পাশে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। বাড়িতে থাকে শুধু দাদা আর দাদী। সকালে জানতে পারলাম মিরপুর গ্রামে পাকবাহিনী নৌকা দিয়ে প্রবেশের সময় ওৎ পেতে থাকা মুক্তিবাহিনী অতর্কিত হামলা চালায়। এতে পাকবাহিনীর এক সৈন্য আহত হয় এবং নৌকায় পড়ে থাকে। তখন সহিদ নামের এক মুক্তিযোদ্ধা সাঁতরে নৌকার নিকটে গেলে আহত পাকসেনা তাকে গুলি করে। সেই গুলিতে তিনি শহীদ হন।

কার্তিক মাসের শেষের দিকে নবীনগর থেকে পাক বাহিনী লঞ্চ করে এসে বাইখালি ঘাটে নামে। বাঘাউড়া গ্রামে এসে ১১ জনকে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে এবং বাড়িঘর আগুন দিয়ে পোড়াতে থাকে। বাঘাউড়া গ্রামের নারী-

পুরুষ সবাই প্রাণভয়ে আমাদের বাড়িতে জমায়েত হয়। পাকসেনারা আমাদের গ্রামের দিকে গুলি করতে করতে অগ্রসর হতে থাকলে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাড়ির উত্তর পাশে গোরস্থানের দিকে আড়ালে গিয়ে পাকবাহিনীর দিকে ব্রাশ ফায়ার করতে থাকে। তখন বেসামাল পাকসেনারা পিছু হটে আকাবপুরের দিকে যায় এবং সেখানে ৬ জন লোককে এক সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়।

ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বিটঘর ইউনিয়নের বুদগাছা বা ভদ্রগাছা গ্রামে পাকবাহিনী আসে। মাঠে আমনধান কাটারত কামলারা মিলে একাকি পাওয়া এক পাকসেনাকে কাচি দ্বারা জবাই করে ফেলে। সাথী পাক সেনারা তাকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পরের দিন আবার ভদ্রগাছা গ্রামে আসে এবং যাকে সামনে পায় তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং বাড়িঘর পোড়াতে থাকে। মহেশপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ লোককে কোরান তেলোয়াত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। ওই দিন আমার দাদী আমাকে তার ভাইয়ের বাড়ি ভদ্রগাছা পাঠায়। আমি তখন বিটঘর হাই স্কুলের নিকটে পৌঁছি তখন কৃষকরা গরুর লাঙল ছেড়ে দৌড়াতে থাকে এবং বলে, 'পাঞ্জাবি আইতেছে, তুমি বাবু ভদ্রগাছা যাইও না। তাড়াতাড়ি পালাও।' আমি পাশের গ্রাম ওয়ারুক এসে শুনলাম, গ্রামে পাঞ্জাবি এসেছে। ওয়ারুকের এক বন্ধু আমাকে বাড়িতে আসতে বাধা দিলেও আমি তা অমান্য করে চলে আসি। মা-বাবা আমাকে দেখে খুশি হলো। তখন নানা খোঁজ নেয়ার জন্য আমাদের বাড়িতে আসেন। পাকসেনারা আমাদের গ্রামের প্রতি খুবই ক্ষেপা ছিল। আমাদের গ্রামের সিরাজুল হক চাচা এবং বাঘাউড়া গ্রামের ছন্দু মৌলভি মিলে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে পাকিস্তানি পতাকাসহ পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে পাকবাহিনীকে এগিয়ে আনতে যায়। আবার ইউনুছ চাচা তার মেয়ে নেহারাকে নিয়ে পুকুরে গোসল করতে যায়। এমন সময় পাকসেনা আসতে দেখে মেয়ে নেহারাকে পাড়ে রেখে সে পুকুর পাড়ের ঝোপের নিকট লুকায়। পাকসেনারা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে চায়। তখন আমার নানাভাই পাকসেনার সহচর রাজাকার বাহিনীর পরিচিত এক সদস্যকে অনুরোধ করে গুলি না ছুড়তে। তারা গুলি ছোড়ে না, আমার চাচা সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। এমনি ভাবে দীর্ঘ নয় মাস তারা আমাদের দেশের মানুষের উপর অত্যাচার করে।

সূত্র: জ-১৩০৪৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
লুৎফুন নাহার সোনিয়া	**মো. শামসুল আলম**
কসবা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল : ০৩	বয়স : ৪৮ বছর

পাঞ্জাবিরা টি আলীর বাড়িতে ক্যাম্প করে

আমার নানার বাড়ি কসবা থানার বিশাড়া গ্রামে। তখন আমার বয়স ছিল ২৫। যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কয়েকজন মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। তখন দৌড়ে এসে একজন লোক বলল, পাঞ্জাবি আসছে! কিছুক্ষণ পর দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অনেকগুলো গাড়ি এবং ট্রাক। পরিবারের সকলকে নিয়ে আমরা আমাদের পাশের গ্রাম আকছিনায় চলে গেলাম। আর পাঞ্জাবিরা টি আলী বাড়িতে গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করলো। সেখান থেকে তারা প্রচণ্ড গোলাগুলি চালাতে লাগলো। এতে অনেক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় এবং অনেক মানুষ মারা যায়। আমার গ্রামের হাজি সৈয়দুর রহমান কসবা থেকে বাজার করে ফেরার পথে তাকে ওরা গুলি করে।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ খুব সকালে তারা কসবা বাজারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে কসবার সব দোকান পুড়ে যায়। মানুষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ওই দিন থেকেই মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর গোলাগুলি শুরু হয়। এই যুদ্ধ শুরু হয় কসবা রেল লাইনে বর্ডারের কাছে। এতে দুই দলেরই অনেক লোক মারা পড়ে। এখান দিয়ে

পাঞ্জাবিরা অনেক লোক ধরে টি আলী বাড়িতে নিয়ে হত্যা করে। নারীদের ধরে এনে অত্যাচার ও নির্যাতন করে। নিহতদের কবর দেওয়ার জন্য আড়াইবাড়ি বাগাইয়া নামক স্থানে গোরস্থান করে। তারপর তারা গ্রামে গ্রামে শুরু করে অপারেশন। অপারেশনে তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পুরুষদের গুলি করে এবং মহিলাদের উপর চালায় নির্যাতন।

আমরা যে গ্রামে ছিলাম সে গ্রামেরও ১৫-২০ জনকে গুলি করে। আমার বাড়ির পূর্ব পাশে আমারই চাচাত দুইভাইকে হাত-পা বেঁধে সবার সামনে গুলি করে। তাদের নাম আব্দুল রউফ এবং শামসুল হক। আমার বাড়ির দক্ষিণে এক চাচাত ভাইয়ের মেয়ে কোহিনুরের উপর শেল পড়ে। এতে সে মারা যায়।

আমরা আকছিনা থেকে বাড়িতে চলে আসি। আমার পাশের গ্রাম আড়াইবাড়ি, সেখানে একজন হাক্কানি আলেম ও পীর ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে যান এবং তার গ্রামের লোকেরা যে যেখানে পারে চলে যায়।

আড়ইবাড়ির পীর সাহেবকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনিয়ে মেজর বলল, আপনি আপনার গ্রামবাসিদের নিয়ে চলে আসতে পারেন। আমরা আপনার কোন ক্ষতি করব না। হুজুরও তার গ্রামের কিছু লোক নিয়ে চলে আসেন। আসার পর পাকবাহিনী মহিলাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। এসব অত্যাচারের কথা পীর সাহেব মেজরকে জানান। মেজর সিপাইকে ডেকে বলে কে কে অত্যাচার করেছে? সিপাহি অন্য সিপাহিদের কথা বলে। তখন তারা আড়াইবাড়ির হুজুরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। একদিন তারা হুজুরকে বলে, হুজুর আপনি রাতে আপনার বাড়ির কাছে লাইট মারবেন, আমরা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে আসব। হুজুর এ বিষয়ে এক সুবেদারের সাথে পরামর্শ করলেন। সুবেদার বলল, হুজুর ওরা আপনাকে মারার পরিকল্পনা করছে। আপনি লাইট মারলে ওরা আপনাকে গুলি করবে। আপনি এখান থেকে পালিয়ে যান। এ কথা শুনেই হুজুর পালিয়ে যান।

কিছুদিন পর আমাকে ধরে নিয়ে গেল টি আলী বাড়ির ক্যাম্পে। সেখানে আরও অনেক লোক ধরে এনেছে ওরা। আমার গ্রামের আব্দুল রহিম মাস্টার ও তার দুই ছেলেকেও ধরে এনেছে। ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে তারা রহিম মাস্টারকে গুলি করে। আর কিছু লোক গিয়ে অতিকষ্টে আমাকে ছাড়িয়ে আনে।

আমার বাড়ির পাশে বিশারাবাড়ি জামে মসজিদের মাঠে তারা ক্যাম্প তৈরি করে। সেখানে ভারত থেকে শেল এসে পড়ে এবং অনেক লোক মারা যায় এবং অনেক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। আমার বাড়ি ঘরও ধ্বংস হয়।

আমরা এখান থেকে চলে গেলাম ৭-৮ মাইল দূরে হাইদাবাদ গ্রামে। সেখানে গিয়ে আমরা কিছুদিন ছিলাম। একদিন ওখানেও হামলা হয়। আমরা সেখান থেকে আবার বাড়িতে ফিরে আসি। এভাবেই কেটে গেল নয় মাস।

সূত্র: জ-১৩০৫১

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
তানিয়া সুলতানা	**শামসুল হক**
কসবা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৭০ বছর
৯ম শ্রেণি, রোল নং- ৩৪	

আমাকে চিনে ফেলেছে, তাকে মেরে ফেলতে হবে

আমার দাদির একমাত্র মামা কুমিল্লা জজ কোর্টের মুহুরি ছিলেন। তাঁর নাম সাদৎ আলী মুহুরি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। একদিন হঠাৎ সাদৎ আলীকে পাকবাহিনী আটক করে হাত-পা বেঁধে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও মারধর করে। তাঁর বাড়ির পাশে একজন আওয়ামী লীগের এম. পি ছিলেন। তার নাম কাজী আকবর উদ্দিন সিদ্দিক। পাকবাহিনী জিজ্ঞেস করে, এম. পি সাহেব কোথায় আছে? মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে? সাদৎ আলী বলেন, তারা কোথায় আছেন আমি বলতে পারি না। পাকসেনাদের সাথে এই গ্রামের একজন রাজাকার ছিল। রাজাকার তার কাছে ১০,০০০ টাকা দাবি করে। তিনি বলেন, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। যা ছিল তা আমার ছেলে-মেয়েরা নিয়ে গেছে। এই বলে তিনি ওই রাজাকারের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। তিনি

বলেন, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাও, পরে তোমার টাকা আমি শোধ করে দিব। তখন রাজাকারটি পাকবাহিনীকে ইশারা দিয়ে বললো, আমাকে চিনে ফেলেছে তাকে মেরে ফেলতে হবে; নইলে আমার অনেক অসুবিধা হবে। তখন পাকবাহিনী তাঁকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গুলি করে চলে যায়। তিনি আহত অবস্থায় পড়ে থাকেন কিন্তু মারা যাননি। আশপাশের কোনো লোকজন ভয়ে যায়নি। তারপর আমার দাদি জানতে পেরে সেখানে যান, তিনি আহত অবস্থায় সব কথা বলেন। আশপাশের লোকজন ভিড় জমায়। রাজাকার জানতে পেরে তাকে সন্ধ্যা বেলায় ঘরের ভেতর রেখে আগুন লাগিয়ে ঘরসহ পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। তাঁর পোড়া দেহ বউ, ছেলে-মেয়ে কেউ চিনতে পারেনি। তখন পাকবাহিনীর ভয়ে গভীর রাতে তার মৃত দেহকে কবর দেয়া হয়।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনিসহ যতজন মারা গেছেন তাদের নামের তালিকা শ্রীরামপুর শতদল পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

সূত্রঃ জ- ১৩৪১৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
ফজলে রাব্বী শুভ	**জুবেদা খাতুন**
নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : শ্রীরামপুর, থানা : নবীনগর
৭ম শ্রেণি, গ শাখা, রোল : ১২	জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	সম্পর্ক : দাদি, বয়স : ৬৫

যাকেই পেয়েছে তাকেই মেরেছে

তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত থানা শহর নবীনগর। এখানে ছিল পাক সেনাদের ক্যাম্প। এখান থেকে নদী পথে লঞ্চযোগে পাক সেনারা হামলা চালায় খরঘর গ্রামে। তারিখটা ছিল ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর। খুব ভোর বেলা, তখন অনেকের ঘুমও ভাঙেনি।
সেই বিভীষিকাময় দিনটির কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। ওই দিন খুব সকাল বেলা আমি ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকালীন ভ্রমণে গ্রামের পশ্চিম দিকে পাগরা নদীর উত্তর পাড় ধরে পশ্চিমে অগ্রসর হতেই দৃষ্টি চলে যায় দক্ষিণ দিকে। সেখানে একটি লঞ্চ এসে ভিড়ে। সাধারণত এ নদীতে লঞ্চ চলাচল করে না। কাজেই আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি এটা কিসের লঞ্চ। আমি তৎক্ষণাৎ বাড়িতে ফিরে আসি। সবাইকে পাক সেনাদের আসার কথা বলতে লাগলাম। তখন অনেকেই ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। এদিকে পাকসেনারা লঞ্চ ভেড়াতেই পূর্বদিকের গ্রামের বড়াইল বাজারের মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে অল্প কয়েক জন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা শুধু রাইফেল হাতে তাদের মোকাবেলা করে। ফলে তারা মুহূর্তেই সাধারণ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যাকে পেয়েছে তাকেই মেরেছে। ওরা রাইফেল এলএমজি মেশিনগান চালিয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধার কারত প্রার্থনা উপেক্ষা করে বেয়নেটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ নিধনে মেতে উঠেছিল ওরা। সম্মুখ যুদ্ধে যে দলটি তাদের প্রতিরোধ করে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের দুইজন তাদের হাতে ধরা পড়ে। তাদের একজন জালশুকা গ্রামের ফুল মিয়া। তাকে পাক সেনারা গুলি করে হত্যা করে। অন্যজন বড়াইল গ্রামের আবুল খায়ের। সে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর কিছুদিন আগে পাক সেনাদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।
২৫ মার্চের পর থেকে যখন তরুণ যুবকেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে তখন খারঘর গ্রামের পূর্বপাশের বড়াইল গ্রামের বাজারে বিভিন্ন শহর, এমনকি রাজধানী থেকেও অনেক যুবক ছেলে এসে জমায়েত হতো। এখান থেকে নৌকাযোগে রাতের অন্ধকারে ভারতের আগরতলার উদ্দেশে পাড়ি জমাতো তারা। সেখানে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শেষে আবার এ পথেই ফিরে আসতো। এভাবে এক সময় বড়াইল বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প গড়ে উঠে। এসব খবরাখবর স্বাধীনতা বিরোধীরা নবীনগরে পাক সেনাদের কাছে পৌঁছে দেয়। তাই তারা ১০ অক্টোবর

সকালে খারঘর গ্রামে অভিযান চালায়। বড়াইল বাজারে লঞ্চযোগে গমন করা সম্ভব ছিল না। উদ্দেশ্য হলো খারঘর গ্রামে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে বাড়াইল বাজারস্থ মুক্তিসেনাদের মনোবল ভেঙে ফেলা। বড়াইল ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা চোরাগোপ্তা হামলা চালাত। সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মতো ভরী অস্ত্র ও গোলাবারুদ তাদের ছিল না। তাই সেদিন তারা পাঞ্জাবি সৈন্যদের মোকাবেলা করতে পারেনি। কাজেই বিনা বাধায় পাক সেনারা খরঘর গ্রামের নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালাতে থাকে। ওরা সমস্ত গ্রামকে তছনছ করে ফেলে। কেউ কেউ উর্দু ভাষায় তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কোনো কথায় তারা কান দেয়নি। কতজন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করেছে। পাক সেনারা সেদিন গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে যাদের হত্যা করে তাদের সংখ্যা ছিল চলিশের ওপরে। আর আহত হয়েছিল দুই শতাধিক নারী, পুরুষ ও শিশু।
যাদের সেদিন আমরা চিরতরে হারিয়েছি নিচে তাদের নাম দেয়া হলো –

ক্রমিক	নাম	বয়স	পিতা/স্বামী
১	আলী আহমেদ	৬৫	আব্বাছ আলী
২	ফুল মিয়া	১৪	আলী আহমেদ
৩	দুরু মিয়া	৪৫	আলী আকবর
৪	মলফত আলী	৬৭	জাগর মামুদ
৫	আলী নেওয়াজ	৪৫	মুন্সি ফাজিল
৬	আফাজ উদ্দিন	১০	আলী নেওয়াজ
৭	আব্দুল খালেক	৫০	আবদুর রহমান
৮	আবুল কাশেম	২২	ইসমাইল
৯	আলছ মিয়া	১৫	ঐ
১০	আবুল হোসেন	১৮	ঐ
১১	হোফিয়া খাতুন	৩০	স্বামী : ইসমাইল
১২	রফিজ উদ্দিন	৫৩	সবদর আলী
১৩	ফাতেমা বেগম	১২	রফিজ উদ্দিন
১৪	আবদুল জলিল	৬২	আফজর উদ্দিন মোল্লা
১৫	মোর্শেদ আলম	৩৫	চেরাগ আলী
১৬	আব্দুছ ছাদির	৩৫	বলি মাসুদ
১৭	জজ মিয়া	২৭	দারগ আলী
১৮	সুরুজ মিয়া	৩০	কফিল উদ্দিন
১৯	মতি মিয়া	২৮	ঐ
২০	আবুল কাশেম	১৮	আবদুল মজিদ
২১	রোকেয়া খাতুন	১০	আবদুল মজিদ
২২	কামাল শাহ	১০	আবদুল আজিদ
২৩	অহিদ মিয়া	২৫	অলি মিয়া
২৪	রহিছ মিয়া	১৩	আবদুছ ছোবান
২৫	আবদুছ ছোবান	৬৫	দানো মিয়া
২৬	আলী আজগর কমান্ডার	৬০	হাবিজ উদ্দিন
২৭	রেনু মিয়া	২৬	আলী আজগর কমান্ডার
২৮	কালা চান	৪৫	হাবিজ উদ্দিন
২৯	মস্তু মিয়া	৪৩	আলফত আলী

৩০	বালা মিয়া	৩২	আব্দুল মালেক
৩১	ধন মিয়া	৩২	গোলাম হোসেন
৩২	তজব আলী	৬০	নোয়াব আলী
৩৩	তয়ব আলী	৪৫	হাজী নজব আলী
৩৪	ধন মিয়া	১২	ফুল মিয়া
৩৫	নিজাম উদ্দিন	৩৫	আবদুল গফুর
৩৬	মালু মিয়া	৬০	জয়দর আলী
৩৭	আহাব আলী	৭০	ইয়াছিন মিয়া
৩৮	জাহার মিয়া	৩০	আরদর আলী
৩৯	সাজেদা বেগম	১০	আলী নেওয়াজ
৪০	লতু মিয়া	৩৫	মাতবর আলী, গ্রাম বড়াইল
৪১	আনু মিয়া	৪০	আরদর আলী, গ্রাম বড়াইল
৪২	হাজী মহরম আলী	৭৫	খোদা বক্স
৪৩	সহিদুল ইসলাম	২৭	হাজী মহরম আলী

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে নবীনগর উপজেলার অন্যান্য গ্রামেও কম বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কোনো গ্রামে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, কোনো গ্রামে মানুষ হত্যা করেছে, সহায় সম্পত্তি বিনষ্ট করেছে। খারঘর একটি ছোট গ্রাম। এ হত্যাযজ্ঞের পর এ গ্রামটি যে ক্ষতির শিকার হয়েছে তা কোনোদিন পূরণ হবার নয়। অনেক পরিবার আজও সেই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আবার কেউ কেউ পঙ্গু জীবনের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে।

সূত্রঃ জ- ১৩৪২২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আশরাফুল আলম	**একেএম ফজলুল হক**
নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সিনিয়র শিক্ষক
৯ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৩	নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
	বয়স : ৫৪, সম্পর্ক : শিক্ষক

ডাক্তারকে নারায়ণপুর নিয়ে হত্যা করে

চৈত্র মাসে একটি জাহাজ নিয়ে মেঘনা নদী দিয়ে পাক হানাদার বাহিনী আমাদের নবীনগরে এসেছিল। বিকাল চারটার সময় নবীনগর সদর থেকে তারা শেল ও কামান ছুড়তে শুরু করে। তখন গ্রামের মানুষ জানত না সেখানে কি হচ্ছিল। কামানের ভয়ে নবীনগরবাসী বিভিন্ন গ্রামে পালিয়ে বেড়ায়। এরপর শুনলাম পাকিস্তানিরা নবীনগর এসে ঘাঁটি গাড়ল। নবীনগরে পাকিস্তানি বাহিনী আসার দ্বিতীয় দিনে আমাদের শ্রীরামপুর গ্রামের ৪০ বছরের কিতাব আলী হানাদার বাহিনীর গুলিতে মারা যায়। পিঠ দিয়ে গুলি করলে লোকটির পেটের সকল নাড়িভূঁড়ি সামনে দিয়ে বের হয়। লোকটির শরীরের রক্তপাত দেখে মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকল। নবীনগর ছেড়ে তারা বিভিন্ন গ্রামে পালিয়ে যেতে থাকল। বাজারে যাওয়া বন্ধ করে দিল।

এরপর আষাঢ় মাস আসলো। নবীনগর থেকে চার কিলোমিটার দূরে কোনাঘাট বাজার। আমি নৌকায় করে দুধ নিয়ে বাজারে গিয়েছিলাম। পাকবাহিনী আসছে দেখে আমি নৌকা ও দুধ ফেলে গ্রামের ভিতর দিয়ে পালিয়ে আসি। দুই ঘন্টা পরে পাকবাহিনী চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার সময় শ্রীরামপুর গ্রামের ৪-৫ জনকে ধরে নিয়ে গেল, একজন ছিল হিন্দু। তাকে পাকবাহিনী নারায়ণপুর নিয়ে হত্যা করে। তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার।

পাকবাহিনী চলে গেলে গ্রামের মানুষ আবার ফিরে আসে। মানুষের জীবনকে গ্রাস করে ভয় ও আতঙ্ক। পাক হানাদার বাহিনী গোপন সংবাদে জানতে পারে সুহাতা গ্রামে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে। পাকবাহিনী সুহাতা গ্রামে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ করলে সেখানে ব্যাপক গোলাগুলি ও কামানের গোলা ছোড়া হয়। শুনলাম সাহাতায় পাকিস্তানি সৈন্য মারা। সেখানে গিয়ে কোনো পাকিস্তানি সৈন্য দেখিনি। শুধু গোলাগুলির আলামত দেখতে পাই।

পাকহানাদার বাহিনী বলত, মুসলমানদের আমরা কিছু করব না। তোমরা বাজারে আসতে পারবে। পাক হানাদার বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খোঁজ-খবর দিত স্থানীয় কিছু রাজাকার ও দালাল। তাদের মধ্যে মহিলাও ছিল। এভাবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস কাটে। পাকবাহিনী বিভিন্ন গ্রামে থেকে কিছু কিছু লোক নিয়ে শান্তিবাহিনী গঠন করে। শান্তিবাহিনী দিয়ে পাকবাহিনী এলাকায় পাহারা দেয়াতো ও মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত। পাকবাহিনী বিভিন্ন গ্রামে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় ক্ষিপ্ত হয়। ফলে নবীনগর এলাকায় আরো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে।

একদিন পাকবাহিনী আলীয়াবাদ-গোপালপুর রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কান্দি ব্রিজের কাছে পৌঁছলে মুক্তিবাহিনী তাদের আক্রমণ করে। উভয়ের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়। পাঞ্জাবি মারা গেছে শুনে সেখানে যাই কিন্তু কোনো লাশ পাইনি। দেখি অসংখ্য গুলির খোসা। এই ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করে। মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। মানুষের কষ্ট ও দুর্ভোগের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের ছিল সীমাহীন কষ্ট। তারা দৈনন্দিন কাজ করতে পারত না। তখন সম্ভবত কার্তিক মাস, হিজরী রমজান মাস চলছিল। শ্রীরামপুর গ্রামে একদিন হানাদারবাহিনী আসে। গ্রামের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই দিন আমাদের গ্রামে মারা যায় ১১ জন। এদের মধ্যে ৯ জন ছিল মুসলমান আর ২ জন হিন্দু। মুসলমানদের মধ্যে কয়েক জনের নাম ছিল সাদির ফকির, লীল মিয়া, সাদু মুহুরী, আব্দুল লতিফ প্রমুখ। তারপর পাক হানাদার বাহিনী গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে নবীনগর চলে যায়।

এর কয়েকদিন পর দেখলাম পাক হানাদারবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল। ২৭ জন পাঞ্জাবি সৈন্য ভারতীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়ল। ১৭ জন পাঞ্জাবিকে ভোলাচং নতুন বাজার গরুর হাটে নিয়ে আসা হলো। আমরা সকালে দেখতে যাই। এরপর আমাদের নবীনগর শত্রুমুক্ত হয়। আমরা স্বাধীনতা পাই।

সূত্রঃ জ- ১৩৪২৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
রমজান হোসেন	**মো. শিশু মিয়া ব্যাপারী**
নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম ও ডাক : শ্রীরামপুর, থানা : নবীনগর
৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল : ৮৬	জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	বয়স : ৫৫, সম্পর্ক : পিতা

তাদের দিয়ে খাবার তৈরি করানো হতো

আমি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি। চট্টগ্রাম কালুরঘাট ইস্পাহানী জুট মিল গোডাউনে তিন বছর কাজ করি। এছাড়া ভিকটোরিয়া জুট মিলে দুই বছর, গোল আহম্মেদ জুট মিলে আট বছর কাজ করি। এরপর চট্টগ্রামে ১৬ বছর কন্ট্রাকটারি করি। ২৫ মার্চ গণ-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাড়িতে আসি এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতের উদ্দেশে রওনা দেই। ৩৫ জন যুবক নিয়ে নৌকাযোগে যাওয়ার পথে তালশহর গ্রামের দক্ষিণে এলে দূর থেকে দেখতে পেলাম লাইনের দুইপাশে হানাদারবাহিনী টহল দিচ্ছে। তখন ৩৫ জনের মধ্যে একজনকে দুলা বানিয়ে মাথায় মুড়াশা দিয়ে আমরা ৩৪ জন বরযাত্রী সেজে রেললাইনের পুলের দিকে রওয়ানা করি। পুলের

কাছাকাছি যাওয়ার পর হানাদার বাহিনী বলল তুমলোক কিধার যাতা হে? নৌকা ভিড়াও। নৌকা ভিড়াইয়া বললাম, আমরা সাদী করানোর জন্য যাইতেছি। নসিংসার গ্রামে। তখন বেলা ৫টা। তারা বলে, টিকসে, তুমলোক চলে যাও।

নসিংসার গ্রামে সমস্ত রাত অবস্থান করি। সকালে পৌঁছলাম কুড়িগ্রামে। কুড়িগ্রাম থেকে রাত্র ১২ টার সময় রওনা করে পরদিন সকাল ১১টায় আগরতলা হাপানীয়া ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে রিক্রুট হওয়ার পর পরদিন সকালে ছাত্রনেতা মাহাবুবুর রহমান আমাদেরকে হেজামারা হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে দেয়। বাহাদুরপুরের কুদ্দুস মিয়া ছিল পথ প্রদর্শক। সেখানে ২২ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমাদেরকে লেবুছড়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে যাওয়ার পর আমরা রান্না করার জন্য চুলা তৈরি করি। লেবুছড়া ক্যাম্পে আমরা ১ মাস ৭ দিন ট্রেনিং করি। মোট ২ মাস ৯ দিন ট্রেনিং করিয়ে ১৬ জনের গ্রুপ আকারে আমাদেরকে বাংলাদেশে পাঠায়। আমাদের গ্রুপের কমান্ডার ছিল আব্দুলাহ, সেকশন কমান্ডার ছিলাম আমি। আমাদের যুদ্ধ এলাকা ছিল আশুগঞ্জ।

প্রথম যুদ্ধের সূচনা হয় আমরা বাড়িতে আসার ৪ দিন পর বেড়তলা গ্রামে। হানাদার বাহিনী বেড়তলার এক বাড়িতে আগুন দেয়। অপারেশনে কমান্ডারসহ ১৫ জন রাজাকার আমাদের হাতে ধরা পড়ে। হানাদার বাহিনী পালিয়ে যায়। এই ১৫ জন রাজাকার মারা যায়। দ্বিতীয় অপারেশন ছিল আশুগঞ্জ। তৃতীয় অপারেশনে আশুগঞ্জে ৩টা বাঙ্কার ধ্বংস করা হয়। পরের অপারেশন হয় সরাইল নাইজুড়ি বটগাছের কাছাকাছি। এখানে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। এর দুই-তিন দিন পর সরাইল থানায় শতশত হানাদার বাহিনী জমাট হয়। পরদিন আরও হানাদার বাহিনী আমাদের এলাকায় অপারেশনে আসে। আমরা ওই রাতে মিটিং করে রওনা করি সরাইল থানা অপারেশনে। সিদ্ধান্ত হয় হানাদার বাহিনীকে এলাকায় আসতে দেয়া হবে না। আমরা ১১ সেকশন মুক্তিযোদ্ধা নয় অক্টোবর রাত ১২টায় সরাইল পৌঁছাই। ৪০ গজের মধ্যে থেকে সরাইল থানায় সমস্ত রাত যুদ্ধ হয়। রাত ৪টায় আমার বাম পায়ের হাঁটুতে গ্রেনেডের আঘাত লাগলে আমরা সরইল হতে পাঁচটার সময় ক্যাম্পে ফিরে আসি। আসার পর দেখা গেল আমাদের মধ্যে তিন জন গ্রেনেডের আঘাত পেয়েছে। সরাইল থানার বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: শহিদুল হকও গ্রেনেডের আঘাত পায়। চার দিন হানাদার বাহিনী থানা এলাকায় কার্ফ্যু দিয়ে লাশ সরায়।

আমাদের ক্যাম্প ছিল তখন বাহাদুরপুর বাজারে। হানাদার বাহিনীর খাদ্য গুদাম আমরা দখল করে ১১০ বস্তা আটা, ৮৭ বস্তা ময়দা, ৮৫ বস্তা চাল, ৪২ বস্তা চিনি ও ৬ শত টিন বিস্কুট উদ্ধার করে মোহনপুর ক্যাম্পে মজুদ করি। তারপর ৫১ জন রাজাকারকে বন্দি করা হয়। তাদেরকে দিয়ে অনবরত রুটি তৈরি করিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও হাজার হাজার শিখ সৈন্যদের খাবার দেয়া হয়।

সূত্র: জ-১৩২০৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
লিপা বেগম	**মো. শহীদুল হক**
রওশনআরা জলিল বালিকা উচ্চ বিদ্যাল	বয়স: ৬৫ বছর
ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল: ২২	

রিজিয়াকে দেখে তারা পছন্দ করে ফেলে

চৈত্র মাসের বুধবার দিন সকালে সবাই যখন বাজারে-বন্দরে, খেতে-খামারে চলে গেছে তখন আশুগঞ্জ বাজারে পাকিস্তানি সেনারা বিমান দিয়ে অবতরণ করে। সারা বাজারে হৈ চৈ শুরু হয়। সবাই যার যার গ্রামে গিয়ে খবর দেয় যে, পাকিস্তানিরা এসে পড়েছে আর থাকার জন্য বাজারে ক্যাম্প তৈরি করছে। তখন আমি আমার মার জন্য একটি কচি মুরগি রান্না করছিলাম। এর এক ঘন্টা আগে আমার বড় ভাই রহিম মিয়া বাজারে মিষ্টি আলু বিক্রি

করতে গিয়েছিল। তখন দেখে পাকিস্তানিরা বিমান থেকে বন্দুক আর বড় বড় ব্যাগ নিয়ে নামছে। তখন আমার বড় ভাই আলুর বস্তা মাথা থেকে ফেলে দৌড়ে চলে আসে। পাকিস্তানিরা সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে গুলি করে মারছে। আমার বড় ভাই তাড়াতাড়ি করে এসে বলছে যে, পাকিস্তানিরা এসে পড়েছে। যার যা কিছু নেয়ার নিয়ে রওয়ানা হও।

তখন আমি আমার মা-বাবা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী মিলে ২০-৩০ জন হলাম। সবাই যার যার কাপড় সঙ্গে করে নেয়। আমি যে আলুগুলো সিদ্ধ করেছিলাম, সেগুলো নেই। নিয়ে সবাই হাঁটতে হাঁটতে আড়াই সিধা আমার বড় খালাম্মার বাড়ি যাই। তখন তারাও বলছে, পাকিস্তানিরা আসছে। তখন আমরা তাদেরকে নিয়ে আমার বড় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি খোলাপাড়া যাই। গিয়ে দেখি যে তারা বলছে, আমরা ভারতে চলে যাব, পাকিস্তানিরা এখানে আসছে। তখন আমরা সবাই বলি যে, এখন কোথায় যাব? পেটেও খিদে, পাও চলছে না, জানও বাঁচাতে হবে। বাচ্চারা খিদেয় কান্নাকাটি করছে। তখন আমি মিষ্টি আলু বের করে সবাইকে দিলাম। সবাই তা খাওয়ার পর কিছুটা আরাম বোধ করল। তারপর চিন্তা করে বললাম, চল সাধনপুরের দিকে যাওয়া যাক। ওখানে আমার এক দূরসম্পর্কের নানাবাড়ি আছে। ওখানে গিয়ে আশ্রয় পেলাম, তিনদিন থাকলাম। শুনলাম সাধনপুরেও নাকি পাকিস্তানি আসছে। তখন আমরা সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে রওনা হলাম চিলোকুট। অর্ধেক পথে গিয়ে দেখা হল এক ছেলের সাথে। সে আগে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। তার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় পেলাম। তখন পেটে অনেক খিদা। তারা আমাদের জন্য গমের রুটি বানিয়ে দেয়। সবাই খেয়ে বিশ্রাম নিলাম।

এভাবে সাত দিন ওখানে থাকলাম। যখন অত্যাচার কমল তখন আমরা আমাদের বাড়ি ফিরে আসি। এসে আবার আমি ও আমার দুই ছেলে-মেয়ে, দুই ভাই, দুই ভাবী আবার রওয়ানা দিলাম বড় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি খোলা পাড়ায়। ওখানে গিয়ে তিন মাস আমরা থাকি। ওখানে পাকিস্তানিদের অত্যাচার কম ছিল। পরে আবার আমরা আমাদের বাড়ি ফিরে আসি।

আমার এক চাচা ছিল, তার নাম আজব লীলা। সে পাকিস্তানিদের টাকা দিয়ে বলেছিল যে, এই গ্রামে যেন অত্যাচার না করে। তারা বলেছিল, অত্যাচার করবে না। তাই আমাদের সবাইকে এনে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। আমরা সবাই তার বাড়িতেই থাকতাম।

আমার এক আপন ফুপাত ভাইয়ের বউ ছিল খুব সুন্দরী। তাদের বাড়ি ছিল আজব লীলা চাচার বাড়ির পেছনে। তখন ছিল বর্ষাকাল, খাল পেরিয়ে যেতে হতো। পাকিস্তানিরা বলেছে আর অত্যাচার করবে না তখন তারা সবাই তাদের বাড়িতে চলে যায়। এর পরের দিন কয়েকটা পাকিস্তানি লোক আসে হাঁস-মুরগি নেয়ার জন্য। আর তখন সবাই জান বাঁচানোর জন্য যে যার বাড়ি থেকে হাঁস-মুরগি ধরে দেয়।

হাঁস-মুরগি নিতে এসে আমার ফুফাত ভাইয়ের বউ রিজিয়াকে দেখে তারা পছন্দ করে ফেলে। বলে রিজিয়াকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন তার কোলে ছিল ছোট মেয়ে। তাকে বলে ঘরে যাওয়ার জন্য। তাদের ইচ্ছে তাকে অত্যাচার করবে। তখন রিজিয়া বলে, আমি ঘরে যাচ্ছি। রিজিয়া তার মেয়েকে বড় জা হাজেরাকে দিয়ে বলল, আমার মেয়েকে রাখ, আমি আসছি। এই বলে দৌড় দিয়ে ঘরে ঢুকে শাড়ি খুলে পেটিকোট আর ব্লাউজ পরে সাঁতার কেটে আজব লীলার বাড়িতে গিয়ে উঠে। আর পেছনে পেছনে পাকিস্তানিরা রিজিয়াকে ধরতে গেলে তার জা হাজেরা বাধা দেয়। ফলে তাকে চুলে ধরে ডান গালে দুটি চড় মারে। সাথে সাথে তার ডান চোখ দিয়ে রক্ত পড়ে। তার পেছনে যখন পাকিস্তানি সেনারা যাচ্ছিল তখন দুটি লোক বাধা দিতে গেলে তাদেরকেও মেরে ফেলে। রিজিয়ার সাথে তারাও আজব লীলার বাড়িতে যায়। আজব লীলাকে রিজিয়া জড়িয়ে ধরে বলছিল যে, চাচা আমাকে বাঁচান। ওরা আমাকে মারতে চাইছে। তখন আজব লীলা বলেছিল যে, আপনারা মেয়েটাকে ছেড়ে দেন। মেয়েটা অসহায়। এতিম মা-বাবা কেউ নেই। এ কথা শুনে তারা রিজিয়াকে ছেড়ে দিয়েছিল।

সূত্র: জ-১৩২১৩

সংগ্রহকারী | বর্ণনাকারী

সাদিয়া ইসলাম রিমলা
রওশনআরা জলিল বালিকা উচ্চ বিদ্যাল
৮ম শ্রেণি, রোল : ১৪

ফাতেমা বেগম
বয়স : ৭০ বছর, সম্পর্ক : দাদি

মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিব

একাত্তরে আমার বয়স ছিল ১৬ বছর। নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। একাত্তরের ১৪ এপ্রিল আশুগঞ্জে পাকিস্তানি আক্রমণের প্রথম দিনই আমাদের বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। মে মাসের শেষ দিকে আমি ও আমার ভাগ্নে বাড়ির কাছে রেল লাইনের পাশে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় একটি রেলগাড়ি আমাদের পাশে এসে থামে। গাড়ি থেকে পাক আর্মিরা আমাদের মুক্তিবাহিনী মনে করে আটক করে। এমন সময় আমার চাচা এবং গ্রামের মুরব্বিরা এসে পাকবাহিনীকে বুঝিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর থেকেই সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেব। জুনের শেষের দিকে আমরা লালপুর, তিনলাখপীর হয়ে আগরতলায় পৌঁছি। সেখানে অস্ত্রবিহীন ৩৩ দিন ট্রেনিং দেয়া হয় এবং সেখান থেকে ৩নং সেক্টর কমান্ডার মেজর সফিউল্লাহ বাছাই করে আমাদের গ্রামের কয়েক জনকে লেবুছড়ায় অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেন। ভারতের শিখ সৈন্যরা আমাদের অস্ত্র ও বিস্ফোরক বিষয়ে ট্রেনিং দেয়। পরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সাথে যোগ দিয়ে আমি তিনমাস আমতলি, দুরনাল, কলকলিয়া, বসুটিয়া, কালাছড়া প্রভৃতি এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। এ সময়ের মধ্যে ৪টি যুদ্ধে পাকবাহিনীর মুখোমুখি হই। সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্টের কাছে বাসুটিয়ার পাকবাহিনীর সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে একনাগাড়ে ৩টি যুদ্ধ হয়। আমরা প্রতিবার বাংলাদেশ সীমান্তে ঢুকে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাতাম। ২-৩ কিলোমিটার বাংলাদেশের সীমানা থেকে পাকবাহিনীকে পিছু হটিয়ে আবার ভারত সীমান্তে চলে যেতাম। এর ফাঁকে ফাঁকে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে রাজাকারদের খুঁজতাম। এক পর্যায়ে দুজন রাজাকার ধরে নিয়ে আমাদের কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করি।

ডিসেম্বররের ৭ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পূর্বাঞ্চলে কালাছড়া এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে যৌথবাহিনীর ৩৬ ঘণ্টাব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে পাকবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধে আমাদের হাতে প্রায় ২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। কালাছাড়া যুদ্ধে আমাদের সাথের একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় ভারতীয় বিএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে তাকে মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি বেঁচেছিলেন কি না তা জানতে পারিনি।

সেই যুদ্ধের পর পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে পিছু হটে আশুগঞ্জের দিকে পশ্চাদাপসরণ করতে থাকে। আমাদের গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ওসমান। এ যুদ্ধের পর আমাদেরকে আবার ক্যাম্পে ফিরিয়ে নেয়।

আমার বড় ভাই মোজাম্মেল হোসেন মজু আমাদের গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। তাকে ও দুই ভাগ্নেকে দেশ স্বাধীনের কয়েকদিন পূর্বে আড়াইসিধা বাজার থেকে সন্ধ্যার সময় একজন অপরিচিত লোক ডেকে নিয়ে যায়। পরে মুখোশধারীরা তাকে হত্যা করে। এ সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে দায়িত্বরত ছিলেন।

বড় ভাই মোজাম্মেল হোসেন শাহাদৎ বরণ করায় দেশ স্বাধীনের পর শহীদ পরিবার হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষরিত একটি সহানুভূতিপত্র, দুই হাজার টাকা ও কয়েক বান্ডিল টিন দিয়েছিলেন।

সূত্র: জ- ১৩২১৬

সংগ্রহাকারী :	বর্ণনাকারী :
ফারিয়া মেহেরীন দৃষ্টি	**মোতাহার হোসেন**
রওশন আরা জলিল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : বৈকণ্ঠপুর, ডাক : বড়তলা
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ২৯	থানা : আশুগঞ্জ, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	বয়স : ৫৪, সম্পর্ক : নানা